অধ্যায় ৯

উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব
Plant Physiology

প্রধান শব্দাবলি (Key words)	
☐ খনিজ লবণ	☐ পত্ররন্ধ্র
☐ প্রস্বেদন	☐ ক্যালভিন চক্র
☐ লিমিটিং ফ্যাক্টর	☐ শ্বসনিক বস্তু

উদ্ভিদের জৈবনিক কর্মকাণ্ড তার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পরিচালিত হয় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভৌত-রাসায়নিক এসব কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে পানি ও খনিজ লবণ উত্তোলন, প্রস্বেদন, নাইট্রোজেন আত্মীকরণ, সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, পুষ্পায়ন প্রভৃতি।

উদ্ভিদবিজ্ঞানের যে শাখায় উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হয় তাকে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বলে।

Stephen Hales নামক একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে বলেন যে, উদ্ভিদ বায়ু থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে এবং সূর্যালোক এতে অংশগ্রহণ করে। তাঁকে **উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের** (Plant Physiology) **জনক বলা হয়।** Plant Physiology শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ *physis* (nature) এবং *logos* (discourse) থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

নিচে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত শারীরতত্ত্বীয় বিষয়গুলো আলোচিত হলো।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ❖ উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া
- ❖ আধুনিক মতবাদসহ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া
- ❖ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা
- ❖ চিত্রসহ পত্ররন্ধ্রের গঠন
- ❖ পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত ও বন্ধ হওয়ার কৌশল
- ❖ পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার বর্ণনা
- ❖ ব্যবহারিক : পত্ররন্ধ্রের চিত্র অংকন করে চিহ্নিতকরণ
- ❖ ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ এন্ড স্ল্যাক চক্রের বর্ণনা
- ❖ ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ এন্ড স্ল্যাক চক্রের তুলনা
- ❖ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় লিমিটিং ফ্যাক্টরের ভূমিকা
- ❖ ব্যবহারিক : সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অপরিহার্যতার পরীক্ষা
- ❖ সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার বর্ণনা
- ❖ অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার বর্ণনা
- ❖ শিল্পে অবাত শ্বসনের ব্যবহার
- ❖ শ্বসনের প্রভাবকসমূহ
- ❖ ব্যবহারিক : অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ : নিষ্ক্রিয় শোষণ
পাঠ ২	উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ : সক্রিয় শোষণ
পাঠ ৩	প্রস্বেদন
পাঠ ৪	পত্ররন্ধ্র
পাঠ ৫	পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধের কৌশল
পাঠ ৬	ব্যবহারিক : পত্ররন্ধ্রের গঠন পর্যবেক্ষণ
পাঠ ৭	সালোকসংশ্লেষণ
পাঠ ৮	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : আলোক পর্যায়
পাঠ ৯	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : অন্ধকার পর্যায়
পাঠ ১০	সালোকসংশ্লেষণে প্রভাবকসমূহের ভূমিকা
পাঠ ১১	ব্যবহারিক : সালোকসংশ্লেষণে CO_2 গ্যাসের অপরিহার্যতার পরীক্ষা
পাছ ১২	শ্বসন
পাঠ ১৩	সবাত শ্বসন : গ্লাইকোলাইসিস
পাঠ ১৪	পাইরুভিক এসিড সক্রিয়করণ ও ক্রেবস চক্র
পাঠ ১৫	ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম
পাঠ ১৬	অবাত শ্বসন
পাঠ ১৭	শিল্পে অবাত শ্বসনের ব্যবহার
পাঠ ১৮	শ্বসনহার, শ্বসনের প্রভাবকসমূহ ও গুরুত্ব
পাঠ ১৯	ব্যবহারিক : অবাত শ্বসনে CO_2 গ্যাসের নির্গমন পরীক্ষা

CamScanner

উদ্ভিদের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া

১. **ব্যাপন (Diffusion) :** নিজস্ব গতিশক্তির (Kinetic energy) প্রভাবে কোন পদার্থের কণার (অণু বা আয়ন) অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে **ব্যাপন** বলে।

২. **ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion Pressure Deficit, DPD) :** যে বল বা চাপের কারণে পানি কোষের ভিতরে প্রবেশ করে তার নাম **ব্যাপন চাপ ঘাটতি**। কোষের **অভিস্রবনিক চাপ** (OP) ও **রসস্ফীতি চাপ** (TP) এর পার্থক্য দিয়ে এর পরিমাপ করা হয়। কোষের পানি শোষণ ক্ষমতা মূলত DPD এর উপর নির্ভরশীল। **DPD = OP – TP.** আধুনিক ভাষায় একে **পানি বিভব** (water potential) বলা হয়।

৩. **অভিস্রবণ (Osmosis) :** একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের জলীয় দ্রবণ একটি নির্বাচনমূলক বা বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দিয়ে বিভাজিত থাকলে যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দ্রাবক বা পানি কম ঘনত্বের দ্রবণ হতে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয় তাকে **অভিস্রবণ** বলে। অর্থাৎ পানির বিশেষ ব্যাপনই হলো অভিস্রবণ।

৪. **অভিস্রবণিক চাপ (Osmotic Pressure) :** একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট একটি দ্রবণ ও তার বিশুদ্ধ দ্রাবককে যদি একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পৃথক করে রাখা যায় তবে বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের অধিক ঘন দ্রবণের প্রবেশকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিক হতে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত দ্রবণের **অভিস্রবণিক চাপ** বলে।

৫. **প্লাজমোলাইসিস (Plasmolysis) :** কোনো কোষ হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি বের হয়ে গেলে ঐ কোষের রসস্ফীতি কমে গিয়ে প্রোটোপ্লাজম সঙ্কোচিত হয়ে যায়। কোষের প্রোটোপ্লাজমের এ সঙ্কোচনকে **প্লাজমোলাইসিস** বলে। কোনো নির্দিষ্ট অসমোটিক বিভব সম্পন্ন কোষকে সমমাত্রিক দ্রবণে নিমজ্জিত করলে কোষের কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

৬. **মূলজ চাপ (Root Pressure) :** মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণের ফলে উদ্ভিদের বহিঃস্তরের কোষগুলোর রসস্ফীতি ঘটে। পূর্ণ স্ফীত অবস্থায় মূলের কর্টেক্সের কোষগুলো যে চাপের সৃষ্টি করে তাকে **মূলজ চাপ** বলে। **স্টকিং** (Stocking, 1956) এর মতে **"মূলের বিপাকীয় কার্যের ফলে জাইলেম বাহিকায় যে চাপের সৃষ্টি হয় তাই মূলজ চাপ।"**

৭. **টারজিডিটি (Turgidity) বা রসস্ফীতি :** অন্তঃঅভিস্রবণ (endosmosis) প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণের ফলে কোষের স্ফীত হওয়ার অবস্থাকে **টারজিডিটি** বলে।

৮. **টারগার প্রেশার (Turgor Pressure) বা স্ফীতি চাপ :** টারজিডিটি তথা রসস্ফীতির জন্য প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক কোষপ্রাচীরের উপর যে সহনীয় চাপের সৃষ্টি হয় তাকে **টারগার প্রেশার** বলে।

৯. **ইমবাইবিশন (Imbibition) :** কলয়েড জাতীয় শুষ্ক বা আংশিক শুষ্ক পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে **ইমবাইবিশন** বলে। যেসব পদার্থ পানি শোষণ করে স্ফীত হয় সেসব পদার্থকে **হাইড্রোফিলিক পদার্থ** বলে। যেমন– আঠা, সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, জেলাটিন ইত্যাদি।

১০. **বাষ্পীভবন (Evaporation) :** কোনো উন্মুক্ত স্থান থেকে পানি বাষ্পে পরিণত হওয়াকে **বাষ্পীভবন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম জড়িত থাকে না। তাই এটি একটি **ভৌত প্রক্রিয়া**।

৯.১ খনিজ লবণ পরিশোষণ (Absorption of Mineral Salts)

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পূর্ণ শারীরিক বিকাশের জন্য **সতেরটি মৌলিক পদার্থ** অপরিহার্য। এগুলো হচ্ছে– কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, বোরন, মলিবডেনাম, সোডিয়াম ও ক্লোরিন। উল্লেখিত ১৭টি অপরিহার্য উপাদানের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া বাকি ১৪টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি থেকেই পরিশোষণ করে।

শারীরবিজ্ঞানের যে শাখায় মাটি থেকে উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ, উদ্ভিদদেহে খনিজ লবণের সঞ্চয়, উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে খনিজ লবণের বন্টন এবং উদ্ভিদ শারীরবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তথা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খনিজ লবণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি বলে। উদ্ভিদদেহের স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি, শারীরিক পরিপূর্ণতা ও ক্ষয়পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়াকে পুষ্টি বলা হয়।

খনিজ লবণ পরিশোষণ অঙ্গ

স্থলজ উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে অজৈব লবণ শোষণ করে। এসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে **মূলরোম** এবং মূলের অগ্রভাগের **কোষবিভাজন অঞ্চলের** নবগঠিত কোষগুলোই (বর্ধিষ্ণু অঞ্চল) লবণ পরিশোষণে অধিক কার্যক্ষম। ধারণা করা হয় যে, জলজ উদ্ভিদের সর্বাঙ্গই লবণ শোষণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রায়োফাইটস **রাইজয়েড** দিয়ে এবং লাইকেন রাইজাইন দিয়ে লবণ শোষণ করে।

কোন্ বা কি অবস্থায় লবণ পরিশোষিত হয় ? উদ্ভিদ কখনো কঠিন অবস্থায় কোনো পদার্থ শোষণ করতে পারে না এবং এ বৈশিষ্ট্যে প্রাণী হতে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ পৃথক। মাটিই খনিজ লবণ সরবরাহের একমাত্র উৎস। খনিজ লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়ন (+) ও ঋণাত্মক আয়ন বা **অ্যানায়ন** (−) -এ বিভক্ত থাকে এবং লবণগুলো উদ্ভিদ আয়ন হিসেবেই পরিশোষণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এর নাম উল্লেখ করা যায়। পানিতে দ্রবীভূত হলে এটি Na+ (ক্যাটায়ন) ও Cl– (অ্যানায়ন)-এ বিভক্ত হয়ে এবং Na+ ও Cl– আয়ন হিসেবেই মূল কর্তৃক শোষিত হয়। আয়ন দুটি সমভাবে অথবা অসমভাবে শোষিত হতে পারে। বিভিন্ন আয়ন শোষণের হার বিভিন্ন প্রকার। K^+ এবং NO_3^- আয়ন সবচেয়ে দ্রুতগতিতে শোষিত হয় এবং Ca^{2+} এবং SO_4^{2-} আয়ন সবচেয়ে মন্থর গতিতে শোষিত হয়। সাধারণ ক্যাটায়নগুলো (+) হলো K^+, Mg^{++}, Ca^{++}, Mn^{++}, Fe^{+++}, Cu^{++}, Zn^{++}, Co^{++}, Na^+ এবং সাধারণ অ্যানায়নগুলো (−) হলো NO_3^-, PO_4^{3-}, BO_3^-, SO_4^{2-}, Cl^-।

লবণ পরিশোষণ কী ? উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশের জন্য মাটি থেকে আয়ন হিসেবে খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াই হলো **লবণ পরিশোষণ**।

উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান

একটি মৌলকে তখনই অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যকীয় বলা যাবে যখন– **১. এ মৌলটি ছাড়া উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক জীবনচক্র** (life cycle) **সম্পন্ন করতে পারবে না** এবং **২. মৌলটি উদ্ভিদ গঠনের বা বিপাকের** (metabolism) **ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অংশ**।

মৌলগুলোকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা–

১. ম্যাক্রোমৌল (৯টি) : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিপাকের জন্য যে সব মৌল বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদেরকে **ম্যাক্রোমৌল** বলে।

২. মাইক্রোমৌল (৮টি) : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিপাকের জন্য যেসব মৌল অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদের বলে **মাইক্রোমৌল**। স্বল্প মাত্রায় এদের প্রয়োজন হয় বলে অনেকে এদের Trace element নামেও পরিচিত।

কিছু মৌল রয়েছে যেগুলো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এগুলোকে **উপকারী মৌল** বলে। যেমন–সিলিকন মৌল ঘাস উদ্ভিদের জন্য **ম্যাক্রোমৌল** এবং C_4 উদ্ভিদের জন্য সোডিয়াম **মাইক্রোমৌল**। সে হিসেবে ম্যাক্রোমৌল ১০টি এবং মাইক্রোমৌল ৯টি বলা যায়। নিচে বর্ণিত ছকের মাধ্যমে উদ্ভিদ যেসব পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে তা দেখানো হলো।

CamScanner

মৌলের নাম	ধাতু/অধাতু	গ্রহণীয় রূপ	শুষ্ক ওজনের ঘনত্ব (m mol/kg)
ম্যাক্রোমৌল			
১. হাইড্রোজেন (H)	অধাতু	H_2O	60,000
২. কার্বন (C)	"	CO_2	40,000
৩. অক্সিজেন (O)	"	O_2, CO_2, H_2O	30,000
৪. নাইট্রোজেন (N)	"	NO_3^-, NH_4^-	1,000
৫. পটাসিয়াম (K)	ধাতু	K^+	250
৬. ক্যালসিয়াম (Ca)	"	Ca^{2+}	125
৭. ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	"	Mg^{2+}	80
৮. ফসফরাস (P)	অধাতু	PO_4^{3-}	60
৯. সালফার (S)	অধাতু	SO_4^{2-}	30
মাইক্রোমৌল			
১০. ক্লোরিন (Cl)	অধাতু	Cl^-	3.0
১১. বোরন (B)	"	BO_3^-	2.0
১২. আয়রন (Fe)	ধাতু	Fe^{2+}, Fe^{3+}	2.0
১৩. ম্যাঙ্গানিজ (Mn)	"	Mn^{2+}	1.0
১৪. জিঙ্ক (Zn)	"	Zn^{2+}	0.3
১৫. কপার (Cu)	"	Cu^{2+}	0.1
১৬. নিকেল (Ni)	"	Ni^{2+}	0.05
১৭. মলিবডেনাম (Mo)	ধাতু	MO_4^{2-}	0.001

[এখানে অধাতু হলো (৮টি)– হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, ক্লোরিন ও বোরন। আর ধাতু হলো (৯টি)– পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, কপার, নিকেল ও মলিবডেনাম।]

মাটিতে খনিজ লবণের প্রাপ্যতা (Availabity of Mineral Salts in Soil)

উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস মাটিস্থ পানি। মাটিস্থ পানিতে এসব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় অথবা কলয়েড দানার সাথে সংলগ্ন অবস্থায় থাকতে পারে। ধারণা করা হয় যে, কলয়েড দানার সাথে সংলগ্ন খনিজ লবণ আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে মূল দ্বারা পরিশোধিত হয়। আয়ন-বিনিময় পদ্ধতিটি ব্যাখ্যার জন্য দু'টি মতবাদ প্রচলিত আছে; যথা– (i) ক্যাটায়ন বিনিময় মতবাদ ও (ii) কার্বনিক এসিড বিনিময় মতবাদ।

i. ক্যাটায়ন বিনিময় মতবাদ (Cation Exchange Theory) : ক্যাটায়ন বিনিময় মতবাদের প্রবক্তাগণ (Jenny & Overstreet, 1939) ধারণা করেন যে, কলয়ডাল দানার সাথে সংলগ্ন আয়নগুলো কখনও একস্থানে স্থির থাকে না। এরা কলয়ডাল দানার গায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে চলাচল করে। মূলের গায়ের আয়নসমূহও একইভাবে চলাচল করে। এভাবে

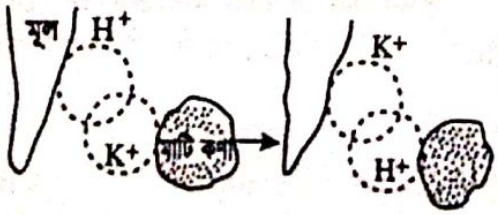

চিত্র ৯.১.১ : ক্যাটায়ন বিনিময় মতবাদের চিত্ররূপ

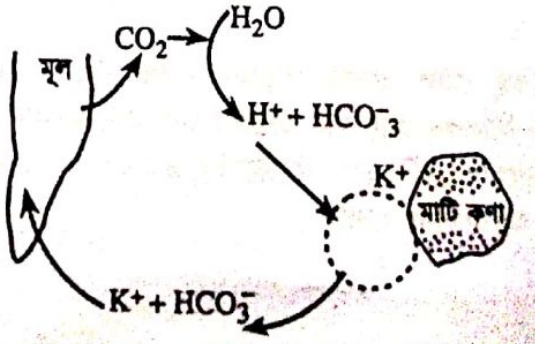

চিত্র ৯.১.২ : কার্বনিক এসিড বিনিময় মতবাদের চিত্ররূপ

চলাচল করার সময় কলয়ডাল দানার সাথে সংলগ্ন আয়ন এবং মূলের গায়ের আয়ন যখন সাধারণ (common) অবস্থানে চলে আসে অর্থাৎ একে অপরের সামনা-সামনি হয় তখনই ক্যাটায়ন বিনিময় সংঘটিত হয়।

ii. কার্বনিক এসিড বিনিময় মতবাদ (Carbonic acid Exchange Theory) : এ মতবাদ অনুযায়ী মূলে শ্বসন প্রক্রিয়া শেষে যে CO_2 মুক্ত হয় তা মাটির পানিতে মিশে কার্বনিক এসিড তৈরি করে। সৃষ্ট কার্বনিক এসিড বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ ও HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়। এ সময় হয়তো অন্য একটি ক্যাটায়ন (K^+) যা কাদামাটিতে সংযুক্ত রয়েছে তা H^+ এর সঙ্গে বিনিময় করে। বিনিময়কৃত ক্যাটায়ন এবার মূলের গায়ে লেগে ভিতরে প্রবেশ করে।

উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়া

উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মাটিতে বিদ্যমান পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণের ঘনত্ব মূলের কোষ রসের ঘনত্ব অপেক্ষা অনেক কম। এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষ হতে লবণ বের হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কীভাবে খনিজ লবণ মূল দ্বারা শোষিত হয় এ সম্পর্কিত সর্বজন স্বীকৃত কোনো মতবাদ নেই। উদ্ভিদ এ ঘনত্ব আনতির (concentration gradient) বিরুদ্ধে খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে। যাহোক, উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রক্রিয়াকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক. সক্রিয় পরিশোষণ বা প্রত্যক্ষ পরিশোষণ এবং খ. নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ বা পরোক্ষ পরিশোষণ।

ক. সক্রিয় লবণ পরিশোষণ (Active Salt Absorption)

যে পরিশোষণে বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন হয় তাকে সক্রিয় পরিশোষণ বলে। ঘনত্ব আনতির (concentration gradient) বিপরীতে এ পরিশোষণ ঘটে বলে এতে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে। মাটিতে বিদ্যমান অধিকাংশ খনিজ লবণই সক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতিতে মূল কর্তৃক গৃহীত হয়। এ প্রক্রিয়ায় অ্যানায়ন (−) ও ক্যাটায়ন (+) একই সাথে পরিশোষিত হতে পারে। খনিজ লবণের সক্রিয় পরিশোষণের গ্রহণযোগ্য কয়েকটি মতবাদ নিচে উল্লেখ করা হলো–

আয়ন বাহক ধারণা (The carrier concept of ion) : আয়ন বাহক ধারণার উপর নির্ভরশীল তিনটি মতবাদ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. লুনডেগড় মতবাদ (Lundegardth theory, 1955) : এ মতবাদকে Cytochrome Pump মতবাদও বলা হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী বাহক হচ্ছে Cytochrome (Cyt.)। লুনডেগড়ের মতানুযায়ী অ্যানায়ন পরিশোষণ প্রকৃতপক্ষে cytochrome system এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। লুনডেগড়-এর মতে কোষঝিল্লির ভিতরের তল-এ ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে প্রোটন (H^+) এবং ইলেকট্রন (e^-) সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনটি সাইটোক্রোম চেইন-এর মাধ্যমে কোষঝিল্লির বাইরের দিকে চলে আসে এবং O_2 এর সাথে মিলে প্রোটন সহযোগে পানি তৈরি করে। এর ফলে কোষঝিল্লির বাইরের তলে সাইটোক্রোমের বিজারিত লৌহ (reduced iron) ইলেকট্রন হারিয়ে জারিত (oxidised) হয় এবং একটি অ্যানায়ন গ্রহণ করে।

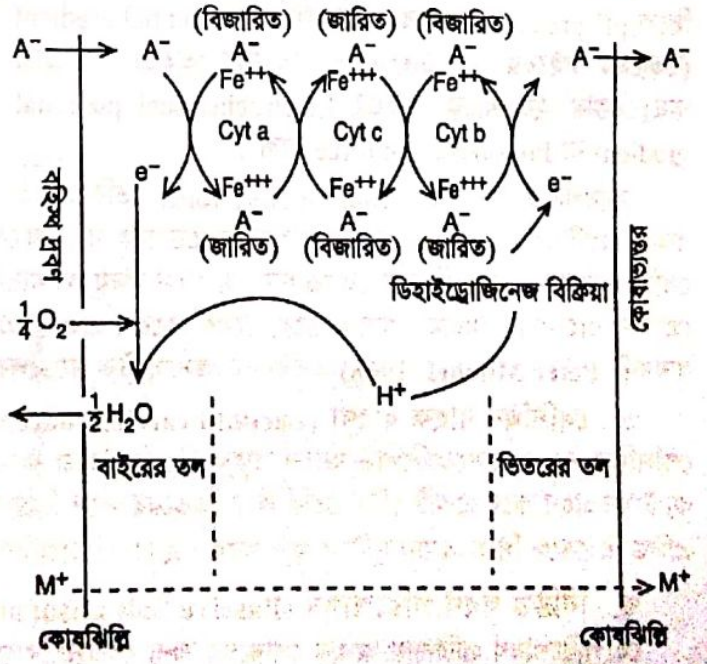

চিত্র ৯.১.৩ : লুনডেগড় মতবাদ অনুসারে আয়ন শোষণ পদ্ধতি

প্রক্রিয়াটি এরূপ : $Fe^{++}(2A^-) - e^- + A^- \longrightarrow Fe^{+++}(3A^-)$

কোষঝিল্লির ভিতরের তলে (inner space) সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ ডিহাইড্রোজিনেজ বিক্রিয়া হতে প্রাপ্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং কোষঝিল্লির বাইরের তলে (outer spacc) সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ যে অ্যানায়ন (A^-) গ্রহণ করে তা বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ভিতরের দিকে মুক্ত করে দেয়। এভাবে ভিতরের দিকে অ্যানায়ন (A^-) জমা হতে থাকে। কিন্তু ক্যাটায়ন (চিত্রে (M^+) শোষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে বহিঃস্থ দ্রবণ থেকে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

লুনডেগড়ের অ্যানায়ন শোষণ মতবাদ নিম্নলিখিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়–

- সাইটোক্রোম পদ্ধতির (cytochromc system) দ্বারা অ্যানায়ন প্রবাহ সংঘটিত হয়।
- কোষঝিল্লির বহিঃস্থ অঞ্চল থেকে অন্তঃস্থ অঞ্চল পর্যন্ত অক্সিজেনের ঘনত্বের নতিমাত্রা বিদ্যমান। অর্থাৎ অক্সিজেনের ঘনত্ব বহিঃস্থ থেকে অন্তঃস্থ অঞ্চলের দিকে ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। ফলে কোষঝিল্লির বহিঃস্থ অঞ্চলে জারণ এবং অন্তঃস্থ অঞ্চলে বিজারণ ঘটে।
- অ্যানায়ন শোষণের সঙ্গে ক্যাটায়ন শোষণের কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যানায়ন (A^-) সক্রিয়ভাবে এবং ক্যাটায়ন (M^+) নিষ্ক্রিয়ভাবে একটি পৃথক কলাকৌশল দ্বারা শোষিত হয়।

২. প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট মতবাদ (Proton-Anion co-transport theory) : আধুনিক ধারণায়, কোষঝিল্লির উভয় দিকে একটি তড়িৎ রাসায়নিক নতিমাত্রা (electrochemical gradient) সৃষ্টির মাধ্যমে আয়নগুলো কোষের ভিতরে স্থানান্তরিত হয়।

এ আধুনিক মতবাদ অনুসারে, আয়ন নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক প্রোটিন বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে বাইরের দ্রবণ থেকে কোষের ভিতরের দ্রবণে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রোটিন নির্দিষ্ট আয়নের বাহক হিসেবে কাজ করে।

ধারণা করা হয় কোষঝিল্লির ভিতরের তলের দিকে ATP-ase এনজাইমের ক্রিয়ায় ATP ভেঙ্গে শক্তি নির্গত হয়। যার প্রভাবে প্রোটন (H^+) কোষের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। একে **প্রোটন পাম্প** বলে।

প্রোটন পাম্পের কারণে কোষের বাইরের সাথে ভিতরের দিকে pH gradient (বাইরে pH কম) এবং potential gradient (কোষের বাইরের +ve চার্জ বেশি, কোষের ভিতরে +ve চার্জ কম) তৈরি হয় যাকে একত্রে Electrochemical potential gradient বা Proton motive force বলে।

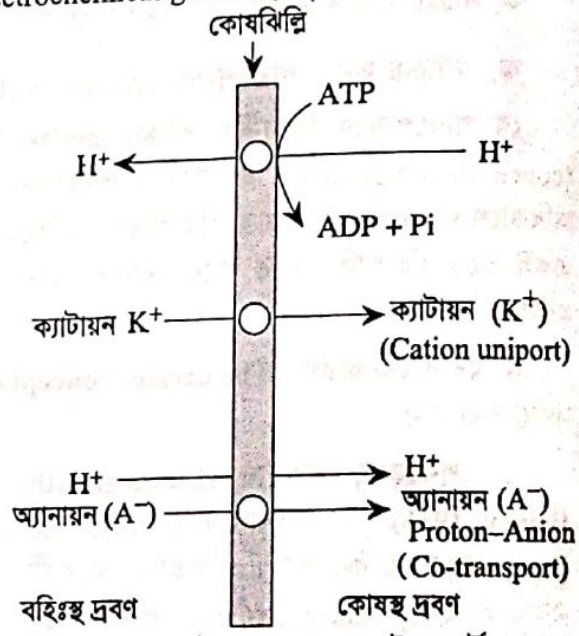

চিত্র ৯.১.৪ : প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট মতবাদ

কোষপর্দার অভ্যন্তরে Proton motive force তৈরি হলেই বাহক প্রোটিনগুলো সক্রিয় হয় এবং ক্যাটায়নগুলোকে বহন করে বাইরের দ্রবণ থেকে কোষের ভিতরে নিয়ে আসে। প্রোটনও বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকতে চায়, আর সে সময় অ্যানায়নগুলো প্রোটনের সাথে (প্রোটন ও অ্যানায়ন একসঙ্গে) প্রোটিন বাহকের মাধ্যমে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এজন্য একে **প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট** বলা হয়। এ ধারণাটি **Peter Mitchel** (1968) এর কেমি-অসমোটিক মডেলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

৩. লেসিথিন বাহক ধারণা (Lacithin carrier concept) : Bennet Clark (1956) নামক বিজ্ঞানীর মতে, লেসিথিন নামক ফসফোলিপিড আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে। লেসিথিন কোষঝিল্লির বাইরের তলে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন গ্রহণ করে একটি যৌগ তৈরি করে ভিতরের তলে নিয়ে যায়। যৌগটি ভিতরের তলে কোলিন-ফসফেটাইডিক এসিড এ ভেঙ্গে গিয়ে আয়ন দুটিকে মুক্ত করে। ATP প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয়।

খ. নিষ্ক্রিয় লবণ পরিশোষণ (Passive Salt absorption)

যে পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় আয়ন শোষণের জন্য কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না সেই পরিশোষণই হলো নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ। এতে শ্বসন হার স্বাভাবিক থাকে। নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ঘটে থাকে:

১. **ব্যাপন মতবাদ (Diffusion Theory) :** মাটিতে অবস্থিত দ্রবণ হতে কোষের অভ্যন্তরে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কিছু আয়ন প্রবেশ করে। উদ্ভিদের লবণ শোষণ অঞ্চলের কোষরসে কোনো আয়নের ঘনত্ব মাটির দ্রবণে অবস্থিত ঐ আয়নের ঘনত্ব হতে কম হলে আয়নটি মাটির দ্রবণ হতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষরসে প্রবেশ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে আয়ন পরিশোষিত হতে থাকে। (Hope & Stevens, 1952)

২. **আয়ন বিনিময় মতবাদ (Ion exchange theory) :** উদ্ভিদমূলের কোষরস হতে হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন বাইরের দ্রবণে নির্গত হয়। তখন কোষের বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য বাইরের দ্রবণ হতে ক্যাটায়ন (K^+) কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। একইভাবে হাইড্রোক্সিল (OH^-) আয়নের বিনিময়ে অ্যানায়ন (Cl^- আয়ন) কোষরসে প্রবেশ করে। আয়ন এক্সচেঞ্জ বলতে আয়নের এরূপ বিনিময়কে বোঝানো হয়। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন একসাথে পরিশোষিত হয় না। ডেভলিন (১৯৬৯), পান্ডে ও সিনহা (১৯৭২) এ মতবাদের প্রবক্তা।

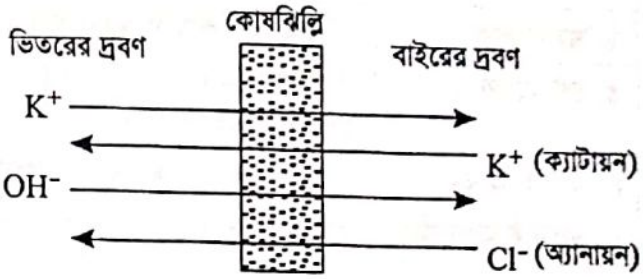

চিত্র ৯.১.৫ : আয়ন বিনিময় মতবাদ অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে আয়ন শোষণ

৩. **ডোন্যান সাম্যাবস্থা তত্ত্ব (Donnan equilibrium theory) :** কোষঝিল্লির অভ্যন্তরে অব্যাপনযোগ্য কিছু স্থির অ্যানায়ন থাকলে, একে নিরপেক্ষ করার জন্য বাহির হতে কিছু ক্যাটায়ন কোষঝিল্লির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কোষঝিল্লির ভিতরে এরূপ স্থির আয়নের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে বাহির হতে ভিতরে একটি সাম্যবস্থায় না পৌছানো পর্যন্ত ক্যাটায়নের ব্যাপন চলতে থাকে। বিজ্ঞানী **Donnan** (1911–1914) এ মতবাদের প্রবক্তা।

ডোন্যান সাম্যাবস্থাতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হলো, বিপাকীয় শক্তি ব্যয় ছাড়াই আয়ন শোষণের মাধ্যমে কোষে আধানের সাম্যাবস্থা সৃষ্টি। ডোন্যান সাম্যাবস্থা কোষের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরিবেশের ধনাত্মক আধানের অনুপাত, কোষের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরিবেশের ঋণাত্মক আধানের অনুপাতের সমান।

$$\frac{\text{কোষের ভিতর} + \text{Ve আয়নের ঘনত্ব}}{\text{কোষ বহিঃস্থ} + \text{Ve আয়নের ঘনত্ব}} = \frac{\text{কোষের ভিতর} - \text{Ve আয়নের ঘনত্ব}}{\text{কোষ বহিঃস্থ} - \text{Ve আয়নের ঘনত্ব}}$$

৪. **ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ (Mass flow theory) :** অনেক বিজ্ঞানী [Hylmo (1955) Kramen (1956)] মনে করেন যে, প্রস্বেদন টানে যখন ব্যাপক হারে পানি পরিশোষিত হয় তখন পানির সাথে সাথে খনিজ লবণের আয়নও পরিশোষিত হয়।

বস্তুর বাইলেয়ার কোষ মেমব্রেন পাড়ি দেয়ার কৌশল

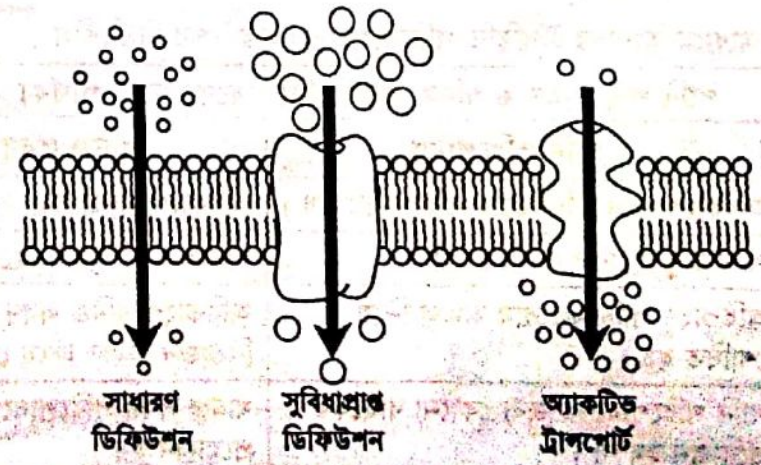

চিত্র ৯.১.৬ : সাধারণ ডিফিউশনের মাধ্যমে, সুবিধাপ্রাপ্ত (প্রোটিন চেনেলের মধ্য দিয়ে) ডিফিউশনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় ট্রান্সপোর্ট হয়। ATP থেকে শক্তি খরচের মাধ্যমে অ্যাকটিভ (সক্রিয়) ট্রান্সপোর্ট ঘটে।

CamScanner

সক্রিয় পরিশোষণ ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	সক্রিয় পরিশোষণ	নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ
১. বিপাকীয় শক্তি	বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে সক্রিয় পরিশোষণ ঘটে।	বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না।
২. শ্বসন হার	সক্রিয় পরিশোষণে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়।	নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায় না।
৩. শোষণের ধরণ	ক্যাটায়ন (+) ও অ্যানায়ন (−) এর শোষণ একই সাথে ঘটে।	ক্যাটায়ন (+) ও অ্যানায়ন (−) একই সাথে শোষিত হয় না।
৪. বাহক আয়ন	বাহক আয়ন বা অণু দ্বারা সম্পন্ন হয়।	কোনো বাহক আয়ন বা অণুর প্রয়োজন হয় না।
৫. এনজাইমের ভূমিকা	এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	এনজাইমের কোনো ভূমিকা নেই।

খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবকসমূহ

উদ্ভিদের অন্যান্য বিপাকীয় কার্যকলাপের মত লবণ পরিশোষণও নিচে বর্ণিত একাধিক প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল।

১. **তাপমাত্রা :** সাধারণ তাপমাত্রার বৃদ্ধি লবণ পরিশোষণের হার বাড়ায়। অতি নিম্ন অথবা অতি উচ্চ তাপমাত্রা লবণ পরিশোষণ হার হ্রাস, এমনকি বন্ধও করতে পারে।

২. **আলো :** পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে আলো লবণ পরিশোষণের উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। উন্মোচিত পত্ররন্ধ্র প্রস্বেদন–টান বৃদ্ধি করে লবণ শোষণের হার বাড়িয়ে দেয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন এবং একই প্রক্রিয়ায় লব্ধ শক্তি পরোক্ষভাবে লবণের শোষণ হার বৃদ্ধি করে।

৩. **অক্সিজেন :** অক্সিজেনের ঘাটতিতে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। শ্বসন হার যেহেতু লবণ পরিশোষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু অক্সিজেনের অভাবে লবণ পরিশোষণও ব্যাহত হয়।

৪. **শ্বসনিক বস্তু :** শ্বসনিক বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে শ্বসন হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে লবণ পরিশোষণের উপর পরোক্ষ প্রভাব পড়ে।

৫. **আয়নের পারস্পরিক ক্রিয়া :** একটি আয়ন শোষিত হলে সেখানে বিদ্যমান অন্য একটি আয়নের উপর তার প্রভাব পড়ে। Ca, Mg আয়নের উপস্থিতি K আয়নের শোষণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

৬. **বৃদ্ধি :** সক্রিয় কোষ বিভাজন অঞ্চল ও বৃদ্ধি অঞ্চলে লবণ পরিশোষণ বেশি ঘটে।

৭. **প্রস্বেদন :** প্রস্বেদন-টান লবণ পরিশোষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৮. **আয়নের ঘনত্ব :** মাটিস্থ দ্রবণে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়নের ঘনত্ব বাড়লে লবণ পরিশোষণের হারও বেড়ে যায়।

৯. **pH :** কোনো মাধ্যমে আয়নের উপস্থিতি পরিবেশের pH এর উপর নির্ভরশীল।

পানি পরিশোষণ ও খনিজ লবণ পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	পানি পরিশোষণ	খনিজ লবণ পরিশোষণ
১. শোষণের অবস্থা	অধিকাংশ পানি নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয়।	অধিকাংশ খনিজ লবণ সক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয়।
২. শোষণ	পানি অণু হিসেবে শোষিত হয়।	খনিজ লবণ আয়ন হিসেবে শোষিত হয়।
৩. শোষণের মাধ্যম	অধিকাংশ পানি মূলরোম অঞ্চল দিয়ে শোষিত হয়।	অধিকাংশ খনিজ লবণ মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চল দিয়ে শোষিত হয়।
৪. বাহক	পানি পরিশোষণের জন্য কোনো বাহকের প্রয়োজন হয় না।	খনিজ লবণ পরিশোষণের জন্য বাহকের প্রয়োজন হয়।
৫. বিপাকীয় শক্তি	পানি পরিশোষণের জন্য বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে না।	খনিজ লবণ পরিশোষণের জন্য বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে।

CamScanner

প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া (Transpiration)

উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে অনুকূল পরিবেশে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। উদ্ভিদের শোষিত পানির কিছু অংশ দেহের বিপাকীয় ক্রিয়ায় বিশেষ করে সালোকসংশ্লেষণে ব্যয় হয় এবং বাকি অংশ বায়ুর মাধ্যমে বাষ্পাকারে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহের বায়বীয় অঙ্গ (সাধারণত পাতা) হতে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তাকে প্রস্বেদন বলে। উদ্ভিদের প্রধান প্রস্বেদন অঙ্গ পাতা, তবে বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত উদ্ভিদের যে কোনো অংশে এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। রক্ষীকোষ দ্বারা প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রস্বেদন সকল স্থলজ উদ্ভিদের একটি স্বাভাবিক জৈবিক (অত্যাবশ্যকীয়) প্রক্রিয়া, তবে এটি কখনো কখনো উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে। বিজ্ঞানী **কার্টিস** বৈশিষ্ট্যের এরূপ বৈপরীত্যের জন্য প্রস্বেদনকে **'প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক পদ্ধতি বা প্রয়োজনীয় অমঙ্গল'** (necessary evil) বলে অভিহিত করেছেন। উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত পানির মাত্র ১%–২% বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয়, বাকি ৯৮%–৯৯% পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রস্বেদনে মরুভূমির একটি খেজুর গাছ প্রতিদিন প্রায় ৪০০–৪৫০০ লিটার পানি এবং একটি ভুট্টা গাছ প্রতি মৌসুমে (৩–৪ মাস) প্রায় ২০০–৩০০ লিটার পানি হারায়। প্রস্বেদনের হার **গ্যানং পটোমিটার** (ganong potometer)-এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

প্রস্বেদনের স্থান অনুযায়ী প্রস্বেদন তিন প্রকার। যথা:

১. **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stomatal transpiration) :** পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন (৯৫–৯৮%);

২. **ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular transpiration) :** পত্রত্বকের কিউটিকলের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন (প্রায় ১%);

৩. **লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration) :** কাণ্ডের লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন (প্রায় ১%)।

নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

১. **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন :** পাতার উর্ধ্ব ও নিম্নতলের এপিডার্মিস, কচিকাণ্ড, ফুলের বৃতি, পাপড়ি, কচিফল প্রভৃতিতে বিস্তৃত বিশেষ আকৃতির ছিদ্রাকার অংশকে **পত্ররন্ধ্র বা স্টোম্যাটা** বলে। **পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে সংঘটিত প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে** বলা হয় **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন**। সাধারণত দিনের বেলা পত্ররন্ধ্রগুলো উন্মুক্ত থাকে। মূলরোম দিয়ে শোষিত পানি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় **পত্ররন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠে** (stomatal chamber) জমা হয় এবং সূর্যালোকের প্রভাবে বাষ্পাকারে পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহের বাইরে নির্গত হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের শতকরা ৯৫ – ৯৮ ভাগ পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

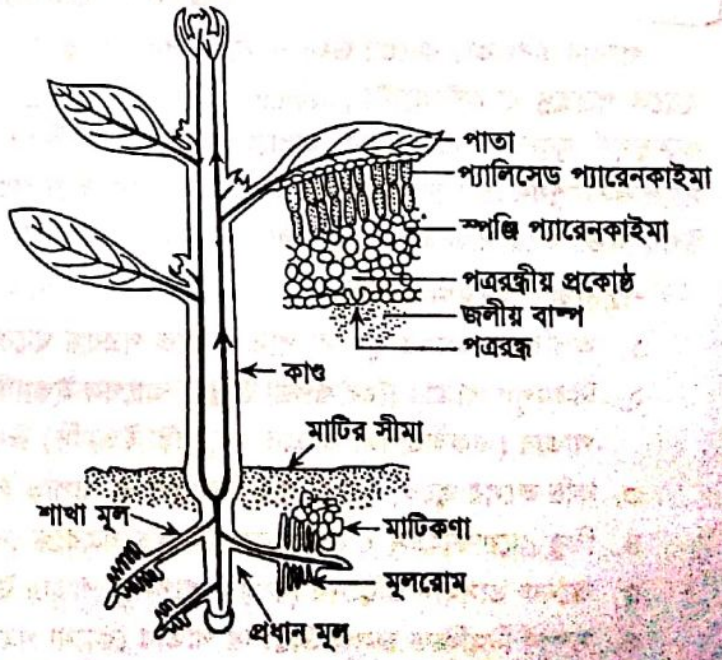

চিত্র ৯.২.১ : উদ্ভিদে মূল কর্তৃক পানি পরিশোষণ এবং পাতা কর্তৃক প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে নির্গমন

২. **কিউটিকুলার বা ত্বকীয় প্রস্বেদন :** উদ্ভিদ দেহকে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষার জন্য বহিঃত্বকের উপর **কিউটিন** (cutin) জাতীয় অভেদ্য রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে সৃষ্ট পাতলা কিংবা পুরু স্তরকে **কিউটিকল** (cuticle) বলে। বিশেষত পাতার উভয়পাশের বহিঃত্বকে কিউটিকল থাকে। কিউটিকল পাতলা হলে অনেক সময় কিউটিকল ভেদ করেও কিছু পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় অর্থাৎ প্রস্বেদন হয়। ত্বকের

কিউটিকল ভেদ করে সংঘটিত প্রস্বেদনকে ত্বকীয় প্রস্বেদন বলে। যদিও পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের তুলনায় এর পরিমাণ অনেক কম, তথাপি অত্যধিক শুষ্কাবস্থায় যখন পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় তখনও ত্বকীয় প্রস্বেদন চলতে পারে।

৩. লেন্টিকুলার প্রস্বেদন : উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় কাণ্ডের কর্ক টিস্যুর স্থানে স্থানে ফেটে গিয়ে লেন্টিসেল (lenticel)- এর সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেল দিয়ে কিছু কিছু পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। পানি যখন বাষ্পাকারে লেন্টিসেল পথে বেরিয়ে যায়, তখন তাকে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে। খুব কম পরিমাণ পানিই এ পথে বের হয়। লেন্টিসেল পেরিডার্ম স্তরে অবস্থান করে এবং সব সময় খোলা থাকে। এজন্য দিবা-রাত্রি সমভাবে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন চলতে থাকে। উদ্ভিদ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ পানি হারায় তার প্রায় ১% লেন্টিকুলার প্রস্বেদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

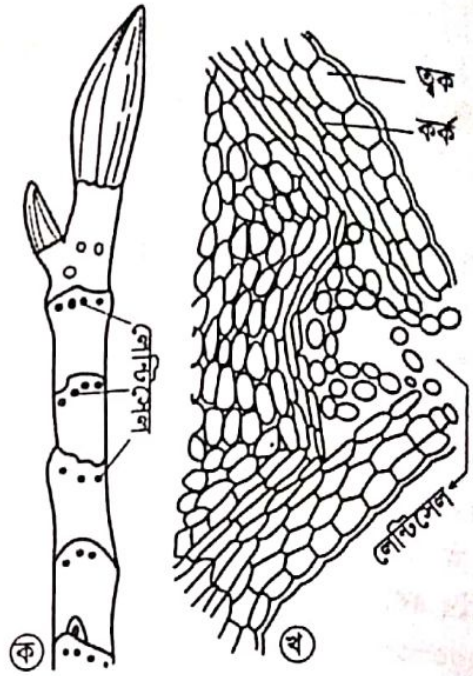

চিত্র ৯.২.২ : লেন্টিসেল-এর (ক) অবস্থান ও (খ) গঠন

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন ও ত্বকীয় প্রস্বেদনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন	ত্বকীয় প্রস্বেদন
১. মাধ্যম	পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয়।	ত্বকের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয়।
২. সংঘটনের সময়	কেবলমাত্র দিনের বেলায় ঘটে।	দিবারাত্রি সবসময় ঘটে।
৩. নিয়ন্ত্রিত মাধ্যম	রক্ষীকোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	কোনোকিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।
৪. প্রস্বেদনের হার	মোট প্রস্বেদনের হার ৯০% এর বেশি।	মোট প্রস্বেদনের ৫ – ১০ ভাগ।

পত্ররন্ধ্র বা স্টোম্যাটা (Stomata)

পাতার এবং কচি কাণ্ডের উর্ধ্ব ও নিম্নতলের বহিঃত্বকে (এপিডার্মিসে) অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম রন্ধ্রকে **পত্ররন্ধ্র বা স্টোম্যাটা** (stomata, একবচনে stoma) বলে। পত্ররন্ধ্র শুধু বিশেষ আকৃতির ছিদ্র নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রাঙ্গ। এ অঙ্গের মাধ্যমে কয়েকটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মাধ্যমে প্রস্বেদন ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। রক্ষীকোষ দ্বারা পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রজাতির উপর নির্ভর করে পাতার প্রতি এক বর্গ সেন্টিমিটার এলাকায় ১,০০০ থেকে ৬০,০০০ পত্ররন্ধ্র থাকতে পারে।

পত্ররন্ধ্রের অবস্থান বা বিস্তার

১. অপরিণত কাণ্ডের ত্বক বা পাতার ত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে। মূলে কোনো পত্ররন্ধ্র থাকে না।
২. বিষমপৃষ্ঠ পাতার (দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, আপেল ইত্যাদি) কেবলমাত্র নিম্ন বহিঃত্বকে এবং সমদ্বিপৃষ্ঠ বা সমাঙ্গ পৃষ্ঠ পাতার (একবীজপত্রী উদ্ভিদে-যব, ভুট্টা ইত্যাদি) উর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় বহিঃত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে।
৩. কচি ফলের ত্বকে, ফুলের বৃতি, দলাংশ বা পাপড়ি ইত্যাদিতে পত্ররন্ধ্র থাকতে পারে।
৪. কিছু ব্রায়োফাইটস ও টেরিডোফাইটসেও পত্ররন্ধ্রে দেখা যায়।
৫. অনেক ভাসমান উদ্ভিদের (যেমন–শাপলা) পাতার উর্ধ্ব বহিঃত্বকে (একে পানিপত্ররন্ধ্র বলে) থাকে।
৬. সম্পূর্ণ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের পাতায় কোনো পত্ররন্ধ্র থাকে না।
৭. কোনো কোনো মরুজ উদ্ভিদে (যেমন: পাইন, রক্তকবরী, ক্যাসুরিনা, ক্যাকটাস ইত্যাদি) পত্ররন্ধ্র ত্বকের ভিতরের দিকে লুকিয়ে অবস্থান করে, এদেরকে লুকায়িত বা নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র (sunken stomata) বলে।

বিশেষ তথ্য – পত্ররন্ধ্রীয় ঘড়ি : বিভিন্ন রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এবং দিন-রাতের সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে পত্ররন্ধ্র এক সময় খুলতে থাকে, কখনো আংশিক বা পূর্ণ খোলা থাকে, আবার বন্ধও হয়– পত্ররন্ধ্রের এরূপ জীবন্ত রূপকে পত্ররন্ধ্রীয় ঘড়ি বলে। পত্ররন্ধ্র দিনে খোলা ও রাতে বন্ধ থাকে।

পত্ররন্ধ্র খোলার সময়–

* সূর্য উঠার সাথে সাথে পত্ররন্ধ্র খুলতে থাকে এবং সকাল ১০-১১ টায় পূর্ণ খোলা থাকে।
* ১১-১ টায় পত্ররন্ধ্র আংশিক খোলা বা অর্ধবন্ধ থাকে (১১ টায় বেশি প্রস্বেদনের ফলে পাতায় পানিশূন্যতা হয় এবং রক্ষীকোষে রসস্ফীতি চাপ কমে গিয়ে পত্ররন্ধ্র অর্ধবন্ধ হয়)।
* ১ টার পর পত্ররন্ধ্র আবার পূর্ণমাত্রায় খুলতে থাকে এবং বিকাল ২-৩ টায় পূর্ণ খোলা থাকে।
* ৩/৪ টার পর আবার বন্ধ হতে থাকে এবং সূর্যাস্তের সময় পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।
* অধিকাংশ উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র রাতে বন্ধ থাকে। Crassulaceae গোত্রের উদ্ভিদে রাতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে।।

পত্ররন্ধ্রের গঠন : পত্ররন্ধ্র পাতার উপরিতলে অবস্থিত দুটি **অর্ধচন্দ্রাকৃতির রক্ষীকোষ** এবং এদের দিয়ে বেষ্টিত **রন্ধ্র** নিয়ে গঠিত। পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষে একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, বহু ক্লোরোপ্লাস্ট ও ঘন সাইটোপ্লাজম থাকে। রক্ষীকোষে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এটি খাদ্য তৈরি করে। রক্ষীকোষের চারদিকে অবস্থিত সাধারণ ত্বকীয় কোষ হতে একটু ভিন্ন আকার-আকৃতির ত্বকীয় **সহকারি কোষ** থাকে। স্টোম্যাটার নিচে একটি বড় **বায়ুকুঠুরী** বা **উপ-পত্ররন্ধ্রীয় গহ্বর** থাকে।

অধিকাংশ উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র সকাল ১০–১১টা এবং বিকাল ২–৩টায় পূর্ণ খোলা থাকে, অন্যান্য সময় আংশিক খোলা থাকে এবং রাত্রিতে বন্ধ থাকে।

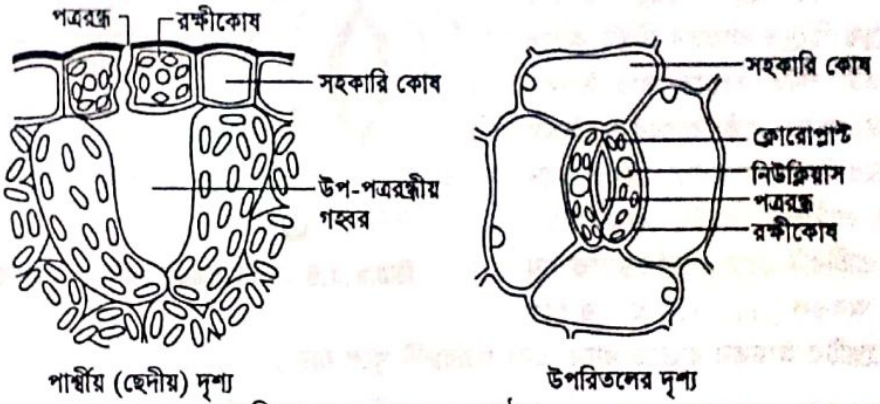

চিত্র ৯.২.৩ : পত্ররন্ধ্রের গঠন

পত্ররন্ধ্রের কাজ : উদ্ভিদের প্রধান তিনটি শারীরবৃত্তীয় কাজে (শ্বসন, সালোকসংশ্লেষণ ও প্রস্বেদন) **পত্ররন্ধ্র অংশগ্রহণ** করে থাকে। যেমন–

১. পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন চলাকালীন সময়ে উদ্ভিদ অঙ্গ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে (O_2 ও CO_2 ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে)।
২. উদ্ভিদদেহ থেকে অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে বের করে দেয়া পত্ররন্ধ্রের প্রধান কাজ।
৩. পরিবেশ শীতল থাকে (তাই মানুষ গাছের নিচে বসে আরাম পায়)।
৪. অধিক তাপের ক্ষতি থেকে উদ্ভিদাঙ্গ রক্ষা পায়।
৫. পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
৬. প্রস্বেদনের সময় পানি জলীয় বাষ্পাকারে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়।
৭. লুক্কায়িত পত্ররন্ধ্র প্রস্বেদনের হার হ্রাস করে।

100%

স্ট্রোমা এবং স্টোম্যাটার মধ্যে পার্থক্য	
স্ট্রোমা	**স্টোম্যাটা**
১. ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সমসত্ত্ব ধাত্রকে স্ট্রোমা বলে। স্ট্রোমা একটি কলয়েড জাতীয় দ্রবণ।	১. উদ্ভিদের পাতার ত্বকে যে ছিদ্র বা রন্ধ্র থাকে তাকে স্টোম্যাটা বলে।
২. স্ট্রোমাতে বিভিন্ন আকারের প্রোটিন দানা, উৎসেচক, শ্বেতসার দানা, লৌহ, প্রোটিন যৌগ, রাইবোজোম, DNA তন্তু, RNA ভিটামিন ইত্যাদি থাকে।	২. স্টোম্যাটা একটি স্টোম্যাটাল-ছিদ্র ও দুটি রক্ষীকোষ নিয়ে গঠিত হয়।
৩. সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার বিক্রিয়া স্ট্রোমায় ঘটে।	৩. অন্তঃটিস্যু ও পরিবেশের বায়ুর মধ্যে গ্যাসীয় আদানপ্রদান স্টোম্যাটা দিয়ে চলে।

পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত ও বন্ধের কৌশল (Mechanism of Stomatal Opening and Closing)

যদি একটি পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ অবস্থা অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ দুটি খোলা অবস্থায় স্ফীত (turgid) এবং বন্ধ অবস্থায় শিথিল অবস্থায় আছে। এ থেকে ধারণা করা হতো পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া নির্ভর করে রক্ষীকোষের আকারের পরিবর্তনের উপর অর্থাৎ রক্ষীকোষের স্ফীতি হলে পত্ররন্ধ্র খুলে যাবে এবং রক্ষীকোষ শিথিল হলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাবে। পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের আয়তন নির্ভর করবে রক্ষীকোষ কতটা স্ফীত হয়েছে তার উপর। স্ফীতি হওয়ার ফলে রক্ষীকোষের বাইরের পাতলা প্রাচীরের দিকে অতিরিক্ত চাপের টানে ভিতরের পুরু প্রাচীরটি কিছুটা বেঁকে যায়। ভিতরের পুরু প্রাচীরটি যেহেতু স্থিতিস্থাপক নয় প্রাচীরটি তাই, অবতল (concave) আকার হয়ে যায় ফলে পত্ররন্ধ্রটির আয়তন বাড়তে থাকে এবং পত্ররন্ধ্রটি খুলে যায়।

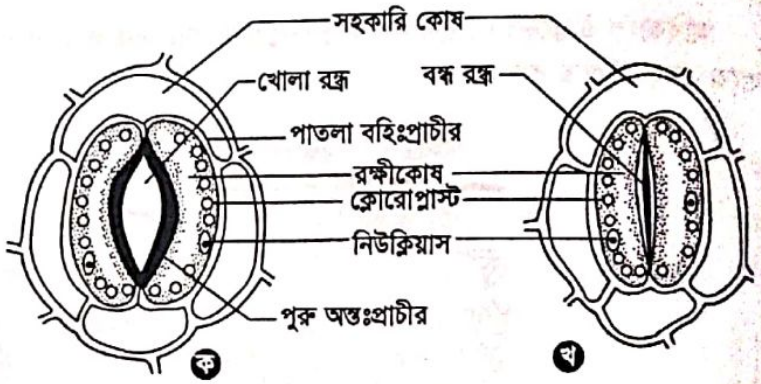

চিত্র ৯.২.৪ : (ক) পত্ররন্ধ্র খোলা ও (খ) বন্ধ হওয়ার কৌশল

সুতরাং বলা যায়, পত্ররন্ধ্রের খোলা এবং বন্ধ হওয়া রক্ষীকোষের স্ফীতি অবস্থার উপর নির্ভর করে। রক্ষীকোষের স্ফীতি অবস্থা কতকগুলো প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রভাবকগুলো– আলো, তাপমাত্রা এবং জলীয়বাষ্প। রক্ষীকোষের স্ফীতি ও শিথিল অবস্থা সৃষ্টির জন্য এগুলোর মধ্যে আলোই প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। কিভাবে রক্ষীকোষের স্ফীতি ও শিথিল হয়ে পত্ররন্ধ্র খোলে এবং বন্ধ হয়, এ বিষয়ে কয়েকটি মতবাদ নিচে আলোচিত হলো।

i. বিজ্ঞানী লয়েড (Loyd, 1908) মত প্রকাশ করেন যে, পত্ররন্ধ্রে রক্ষীকোষস্থ কোষরসের অভিস্রবণিক চাপের তারতম্যের উপর পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়া নির্ভরশীল এবং এ তারতম্য কোষস্থ চিনি ও শ্বেতসারের আন্তঃপরিবর্তনের জন্য ঘটে থাকে। শ্বেতসার অদ্রবণীয় হওয়ায় এর উপস্থিতিতে রক্ষীকোষদুটির অভিস্রবণিক চাপ কমে যায়, ফলে কোষস্থ পানির বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে এবং এটি শিথিল হয়ে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে যখন অদ্রবণীয় শ্বেতসার থেকে অধিকমাত্রায় দ্রবণীয় চিনি তৈরি হয় তখন অভিস্রবণিক চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে এবং রক্ষীকোষ দুটির রসস্ফীতি ঘটে, ফলে বাইরের দিকে বেঁকে যায় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

ii. বিজ্ঞানী স্যায়েরি (Sayre, 1926)-র মতে, শ্বেতসার ও চিনির উক্ত আন্তঃপরিবর্তনটি কোষরসের pH এর জন্য ঘটে থাকে এবং তাঁর মতে, কোষরসের pH এর উঠা-নামাই পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্য দায়ী। উচ্চ pH (৭–এর কাছাকাছি) পত্ররন্ধ্র খুলতে সাহায্য করে এবং নিম্ন pH (৫–এর কাছাকাছি) পত্ররন্ধ্র বন্ধ হতে সাহায্য করে।

CamScanner

রাত্রিকালে আলো না থাকাতে সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ থাকে কিন্তু শ্বসন চলতে থাকে। শ্বসনের ফলে সৃষ্ট CO_2 রক্ষীকোষের কোষ রসে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক এসিডের সৃষ্টি হলে pH কমে যায়। এ অবস্থায় (p^H5) ফসফোরাইলেজ এনজাইম দ্রবণীয় গ্লুকোজ-১-ফসফেটকে অজৈব ফসফেট এবং অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত করে, ফলে পানির বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে এবং রক্ষীকোষ দুটি স্ফীতি হারিয়ে ফেলে। এর ফলে রক্ষীকোষ দুটি শিথিল হয়ে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

দিনের বেলায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রক্ষীকোষ দুটিতে সালোকসংশ্লেষণের ফলে কোষরসে দ্রবীভূত CO_2 ব্যবহৃত হয়ে যায় এবং কোষরস আর ততটা এসিডিক থাকে না, অর্থাৎ pH বেড়ে যায়। কোষরসের অবস্থা যখন p^H7 হয় তখন উপরোক্ত ফসফোরাইলেজ এনজাইম অজৈব ফসফেট এবং শ্বেতসারকে দ্রবণীয় গ্লুকোজ-১-ফসফেটে পরিণত করে, ফলে অভিস্রবণিক চাপ বেড়ে যায়। অভিস্রবণিক চাপ বেড়ে যাওয়ায় অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পার্শ্ববর্তী কোষ হতে রক্ষীকোষে পানির প্রবেশ ঘটে এবং রক্ষীকোষ স্ফীত হয়ে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। এ বিক্রিয়াকে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে:

$$\underset{\text{(অদ্রবনীয়)}}{\text{শ্বেতসার + অজৈব ফসফেট}} \underset{\text{অন্ধকার, } p^H5}{\overset{\text{ফসফোরাইলেজ, আলো } p^H7}{\rightleftharpoons}} \underset{\text{(দ্রবণীয়)}}{\text{গ্লুকোজ ১-ফসফেট}}$$

iii. **স্টার্চ-গ্লুকোজ পরস্পর রূপান্তর মতবাদ (Theory of starch-glucose interconversion) :** বিজ্ঞানী স্টিওয়ার্ড (Steward, 1964) এর মতে, শ্বেতসার ও গ্লুকোজ-১-ফসফেট উপাদান উভয়ই অদ্রবণীয় হওয়ায় অভিস্রবণিক চাপের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সৃষ্ট উপাদানটি ফসফোগ্লুকোমিউটেজ এনজাইমের সাহায্যে প্রথমে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট এবং পরে ফসফাটেজ এনজাইমের সাহায্যে গ্লুকোজে পরিণত হলে রক্ষীকোষে অভিস্রবণিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে p^H5 থেকে বেড়ে p^H6 এ পৌঁছে। তখন পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ বেঁকে গিয়ে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। এ ঘটনা বিপরীতমুখী ঘটলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

iv. **আধুনিক মতবাদের আলোকে পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া (প্রোটন প্রবাহ মতবাদ) (Mechanism of opening and closing of stomata in the light of Modern Theory)**

S. Imamura ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রক্ষীকোষে পটাসিয়াম আয়ন প্রবেশ প্রমাণ করেন। পরবর্তী বহু গবেষণায় রক্ষীকোষে পটাসিয়াম আয়নের প্রবেশকে রক্ষীকোষের স্ফীতির মূল কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

পত্ররন্ধ্র খোলা (আলোতে) : আলোক বর্ণালীর নীল অংশ (blue light) রক্ষীকোষের রিসেপ্টর (সেন্সর) গুলোকে উদ্দীপ্ত করে, যার ফলে সক্রিয়ভাবে পটাসিয়াম আয়ন (K^+) রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। K^+ প্রবেশের কারণে কোষস্থ দ্রবণে দ্রবের (solute) ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ পানির পরিমাণ কমে যায়) এবং পার্শ্ববর্তী কোষ হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। রক্ষীকোষে পানি প্রবেশের ফলে রক্ষীকোষ স্ফীত হয় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। কোষে CO_2 এর পরিমাণ কমে গেলে (সালোকসংশ্লেষণের ফলে এমন হয়) রক্ষীকোষে K^+ প্রবেশ বৃদ্ধি পায়, ফলে পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে এবং রক্ষীকোষ স্ফীত হয়ে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। রক্ষীকোষ থেকে সক্রিয়ভাবে H^+ বের হয়ে গেলেও পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

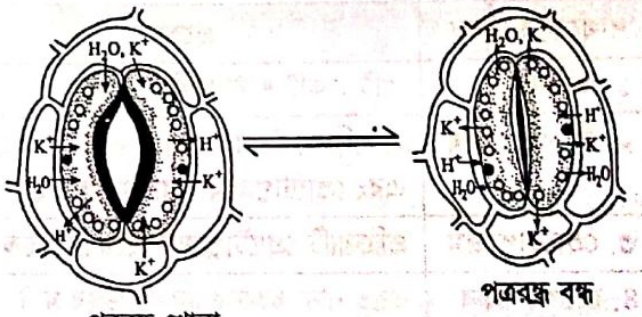

চিত্র ৯.২.৫ : পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধে K^+ প্রোটিন প্রবাহ মতবাদ

পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়া (অন্ধকারে) : রক্ষীকোষ থেকে K^+ বের হয়ে যায় (আলোর অভাবে বা অন্য কোনো কারণে), সাথে সাথে পানিও বের হয়ে যায়। ফলে রক্ষীকোষ স্ফীতি হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। মেসোফিল কোষে পানির অভাব দেখা দিলে সেখানে অ্যাবসিসিক এসিড তৈরি হয়। যার ফলে রক্ষীকোষ থেকে K^+ বের

হয়ে যায়। K^+ বের হয়ে গেলে পানিও বের হয়ে যায়, ফলে রক্ষীকোষ স্ফীতি হারায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। উচ্চ তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ কমে যায় এবং কোষীয় শ্বসন বেড়ে যায়। এর ফলে কোষে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরিণামে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়া (Mechanism of Stomatal Transpiration)

যে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয়ে তাকে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বলে। এ প্রক্রিয়াটি সাধারণত দিনের বেলায় ঘটে, কারণ সূর্যের আলোর সাথে পত্ররন্ধ্রের উন্মুক্ত হওয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। রাতের বেলায় পত্ররন্ধ্র সাধারণত বন্ধ থাকায় পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন হয় না। পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয় :

১. **মেসোফিল টিস্যুর পানির বাষ্পীভবন :** মূলরোম দ্বারা মাটি থেকে শোষিত পানি পাতার শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা টিস্যুর কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মেসোফিল কোষের ভিতর থেকে বাইরে আসে। মেসোফিল কোষের বহির্ভাগে অবস্থিত পানি বাষ্পীভূত হয়ে আন্তঃকোষীয় অবকাশে জমা হয়। পরে এই বাষ্প পত্ররন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠে জমা হয়।

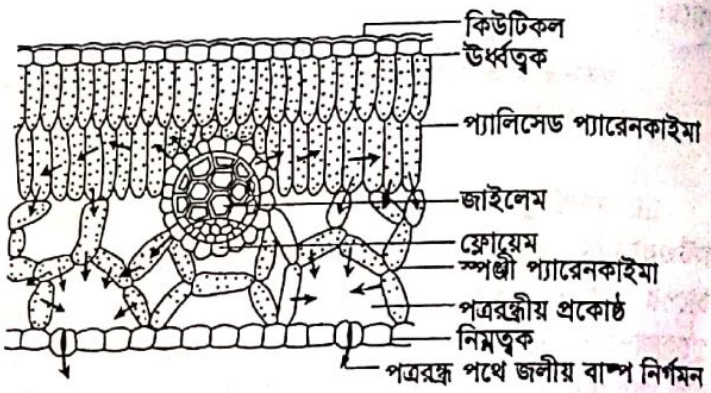

চিত্র ৯.২.৬ : পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন

২. **পত্ররন্ধ্রের উন্মুক্ত হওয়া :** দিনের বেলায় রক্ষীকোষে বিভিন্ন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং আয়নের বিনিময় ঘটে। এরূপ কৌশলগত প্রক্রিয়ার ফলে রক্ষীকোষের অভিস্রবণিক চাপ বৃদ্ধি পেয়ে অন্তঃঅভিস্রবণ ঘটে এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

৩. **জলীয় বাষ্পের ব্যাপন :** বাইরের বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে আন্তঃকোষীয় অবকাশ ও পত্ররন্ধ্রের নিচের গহ্বরে সঞ্চিত গ্যাস ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খোলা পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন ঘটে।

প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	প্রস্বেদন	বাষ্পীভবন
১. প্রক্রিয়া	এটি একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া।	এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া।
২. জীবিত কোষ	এ প্রক্রিয়া জীবিত কোষে সংঘটিত হয় এবং প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	কোনো জীবিত কোষ এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে না।
৩. প্রোটোপ্লাজম	প্রক্রিয়াটি প্রোটোপ্লাজম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।	প্রোটোপ্লাজমের কোনো ভূমিকা নেই।
৪. চাপের উদ্ভব	এতে নানা ধরনের চাপের উদ্ভব ঘটে।	এতে কোনো ধরনের চাপের উদ্ভব ঘটে না।
৫. পাতা	এতে পাতার তলে (surface) আর্দ্রতা দেখা যায়।	এতে পাতার উপরিতলে শুষ্কতা দেখা দেয়।
৬. বাষ্প	এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহের অতিরিক্ত পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং স্টোম্যাটা, লেন্টিসেল ও কিউটিকল দিয়ে নির্গত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় যে কোন উন্মুক্ত স্থান থেকে পানি সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়।

প্রস্বেদনের প্রভাবকসমূহ

যেসব কারণে প্রস্বেদনের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে সেগুলোকে প্রস্বেদনের প্রভাবক বলা হয়। প্রস্বেদনের প্রভাবকসমূহকে দুভাবে ভাগ করা যায়, যথা–ক. বাহ্যিক প্রভাবক এবং খ. অভ্যন্তরীণ প্রভাবক।

ক. বাহ্যিক প্রভাবক

১. আলো : প্রস্বেদন হারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাবক হচ্ছে আলো। আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খুলে যায় এবং আলোর অনুপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়। এছাড়া আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ক বিদ্যমান। বেশি তাপমাত্রায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পায় ফলে প্রস্বেদন বাড়ে। আলোর তীব্রতা কম হলে তাপমাত্রা কমে; তাপমাত্রা কমলে বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যায়। ফলে প্রস্বেদনের হারও কম হয়। নীল আলো পত্ররন্ধ্র খোলা ত্বরান্বিত করে।

২. তাপমাত্রা : তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুর আর্দ্রতা কমে ফলে প্রস্বেদন হার বাড়ে। তাপমাত্রা কমলে বায়ুর আর্দ্রতা বেড়ে যায় অর্থাৎ বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে প্রস্বেদন হারও কমে যায়।

৩. আর্দ্রতা : প্রস্বেদনের হার বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণের সাথে বিপরীতভাবে উঠানামা করে। অর্থাৎ বায়ুর আর্দ্রতা কম হলে প্রস্বেদন বেশি হয় এবং আর্দ্রতা বেশি হলে প্রস্বেদন কম হয়।

৪. বায়ুচাপ : বায়ুচাপ কম হলে প্রস্বেদন বেশি হয় এবং বায়ুচাপ বেশি হলে প্রস্বেদন কম হয়।

৫. বায়ু প্রবাহ : বায়ু শান্ত থাকলে প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের চারপাশে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ফলে প্রস্বেদনের হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। বায়ু প্রবাহ থাকলে আর্দ্র বায়ুর স্থান শুষ্ক বায়ু দখল করে নেয় বলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়।

৬. মাটিস্থ পানি : মাটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকলে উদ্ভিদ বেশি পানি শোষণ করতে পারে। কাজেই প্রস্বেদনও বেশি হয়। এর বিপরীতে প্রস্বেদন কম হয়।

খ. অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

১. পত্ররন্ধ্র : পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের প্রধান অঙ্গই হচ্ছে পত্ররন্ধ্র। কাজেই পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, অবস্থান, বিস্তার, রক্ষীকোষের গঠন, রন্ধ্রের আয়তন ইত্যাদির উপর প্রস্বেদন হার নির্ভরশীল। পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা যত বেশি হবে প্রস্বেদন হারও তত বেশি হবে। পত্ররন্ধ্রের অবস্থানও প্রস্বেদন হারকে প্রভাবিত করে। লুক্কায়িত (sunken) পত্ররন্ধ্র অপেক্ষা স্বাভাবিক পত্ররন্ধ্র দ্বারা প্রস্বেদন বেশি হয়।

২. পাতার আয়তন ও সংখ্যা : পাতার আয়তন ও সংখ্যা যত বেশি হয় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যাও তত বেশি হয়। পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা বেশি হলে প্রস্বেদনের হারও বাড়ে।

৩. পত্রফলকের গঠন : অখন্ডিত (আম, কাঁঠাল) সরল পাতার ফলকে বেশি পত্ররন্ধ্র থাকে। খণ্ডিত ও যৌগিক পাতার ফলকে পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হয়। পত্ররন্ধ্রের সংখ্যার তারতম্যের কারণে প্রস্বেদন হারেরও তারতম্য হয়। পাতলা কিউটিকল ও একস্তরবিশিষ্ট বহিঃত্বকযুক্ত পাতায় যে হারে ত্বকীয় প্রস্বেদন হয়, পুরু কিউটিকল (খেজুর) ও একাধিক স্তরবিশিষ্ট বহিঃত্বকযুক্ত পাতায় প্রস্বেদনের হার সে তুলনায় অনেক কম হয়।

৪. মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ : পাতার মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ বেশি হলে প্রস্বেদন হার বাড়ে। পক্ষান্তরে মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ কমলে প্রস্বেদন হার কমে যায়।

৫. মূল-বিটপ অনুপাত : বিটপের তুলনায় মূলতন্ত্র কম হলে মাটি থেকে শোষিত পানির পরিমাণ কমে যায়। ফলে প্রস্বেদনের হারও কমে। শোষণ অঞ্চল অপেক্ষা প্রস্বেদন অঞ্চল বেশি হলে প্রস্বেদন হার কমে। পক্ষান্তরে প্রস্বেদন অঞ্চল অপেক্ষা শোষণ অঞ্চল বাড়লে প্রস্বেদন হার বেশি হয়।

৬. উদ্ভিদের জীবনীশক্তি : উদ্ভিদের জীবনীশক্তিও প্রস্বেদন হারকে প্রভাবিত করে। রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ অপেক্ষা সুস্থ সবল উদ্ভিদ দেহে প্রস্বেদনের হার বেশি হয়।

CamScanner

উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

উদ্ভিদের একটি স্বাভাবিক জীবনরক্ষাকারী জৈবনিক ও শারীরিক প্রক্রিয়া হলো প্রস্বেদন। উদ্ভিদ জীবনে এ প্রক্রিয়ার উপকারী ভূমিকা ও অপকারী ভূমিকা উভয়ই রয়েছে।

❑ উপকারী ভূমিকা

১. **পানি শোষণ :** পাতায় প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় পানির যে টান পড়ে তা মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণে সাহায্য করে। তাই জীবন রক্ষাকারী পানি শোষণে প্রস্বেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. **রসের উর্ধ্বস্রোত :** প্রস্বেদনের ফলে যে ব্যাপন চাপ ঘাটতির (Diffusion Pressure Deficit = DPD) সৃষ্টি হয় তা সরাসরি পানি এবং খনিজ লবণকে জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে পাতায় পৌছাতে সাহায্য করে।

৩. **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ :** বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের জন্য পাতায় একটি উপযুক্ত তাপমাত্রা দরকার। প্রস্বেদন উদ্ভিদকে অত্যধিক গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং উপযুক্ত তাপমাত্রা প্রদান করে।

৪. **লবণ শোষণ :** প্রস্বেদন টানের ফলে পানি ছাড়াও পানিতে দ্রবীভূত লবণ উদ্ভিদদেহে শোষিত হয়।

৫. **বৃষ্টিপাত :** প্রস্বেদনের ফলে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে গিয়ে আকাশে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। যে এলাকায় গাছপালা বেশি থাকে সে এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

৬. **সকল কোষে পানি সরবরাহ :** প্রতিটি জীবিত কোষেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এর জন্য পানির প্রয়োজন। প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার কারণে পানি সহজে সকল কোষে পৌছাতে পারে।

৭. **সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য :** সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরির জন্য পানির প্রয়োজন। প্রস্বেদন না হলে এই বিপুল পরিমাণ পানি পাতায় পৌছাতে পারত না। ফলে সালোকসংশ্লেষণ তথা খাদ্য তৈরি কম হতো।

৮. **পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ :** খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রস্বেদন টানের মাধ্যমে পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ হয়ে থাকে।

৯. **পানিসাম্য রক্ষা :** উদ্ভিদদেহে শোষিত প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি প্রস্বেদনকালে বর্জিত হওয়ায় যেমন উদ্ভিদদেহে পানিসাম্য বজায় থাকে, তেমনি অন্যদিকে দেহে পানির অভাব ঘটলে পত্ররন্ধ্র তথা অন্যান্য বায়বীয় অংশগুলো বন্ধ হয়েও পানিসাম্য বজায় থাকে।

১০. **খাদ্য পরিবহন :** প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিবহন অব্যাহত থাকে।

১১. **গ্যাসীয় বিনিময় :** সালোকসংশ্লেষণকালে উন্মুক্ত পত্ররন্ধ্র দিয়ে পরিবেশ থেকে একদিকে যেমন CO_2 উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে অন্যদিকে তেমনি উদ্ভিদদেহ থেকে O_2 পরিবেশে মুক্ত হয়। আবার শ্বসনকালে বিপরীত ক্রিয়ায় CO_2 ও O_2-এর বিনিময় ঘটে।

১২. **কোষ বিভাজন :** কোষ বিভাজনের জন্য কোষের স্ফীত অবস্থার প্রয়োজন। আর প্রস্বেদন পরোক্ষভাবে কোষকে স্ফীত হতে সাহায্য করে কোষ বিভাজনে ভূমিকা রাখে।

১৩. **ছত্রাকের আক্রমণ রোধ :** প্রস্বেদনের ফলে পাতার পৃষ্ঠে কিছু পানিগ্রাহী লবণ জমা হয়, যা ছত্রাকের আক্রমণ থেকে পাতাকে রক্ষা করে।

১৪. **শক্তি নির্গমন :** পাতায় পতিত সৌরশক্তির মাত্র ১% বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যয় হয়। বাকি তাপশক্তি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। নতুবা উদ্ভিদ অধিক তাপে মারা যেত।

১৫. **অভিস্রবণ :** প্রস্বেদনের ফলে কোষরসের ঘনত্ব বাড়ে, ফলে অভিস্রবণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়।

১৬ **দৈহিক বৃদ্ধি :** স্বাভাবিক প্রস্বেদন উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১৭. **পুষ্প প্রস্ফুটন ও ফল সৃষ্টি :** প্রস্বেদনের ফলে কোষে পরম রসস্ফীতি রক্ষা পায় বলে পুষ্প প্রস্ফুটন ও ফল সৃষ্টি সম্ভব হয়।

❑ অপকারী ভূমিকা

১. প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে বাষ্পাকারে পানি বের করে দিতে উদ্ভিদের শক্তির অপচয় হয়।

২. প্রস্বেদনের কারণে উদ্ভিদের শোষিত পানির অপচয় হয়।

৩. শোষিত পানির পরিমাণ অপেক্ষা প্রস্বেদন বেশি হলে উদ্ভিদ শুকিয়ে (wilting) মারা যেতে পারে।

৪. খরা অবস্থায় মাটিতে যখন কম পানি থাকে তখন অধিক প্রস্বেদন হলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে পানির অভাবে মারা যেতে পারে।

CamScanner

প্রস্বেদন হ্রাসের জন্য উদ্ভিদের অভিযোজন

প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দেহ থেকে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় পানি নির্গত করে। কিন্তু অনেকসময় প্রস্বেদন উদ্ভিদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু উদ্ভিদ প্রস্বেদন রোধের জন্য তাদের অঙ্গসংস্থানিক রূপান্তর ঘটায়। নিম্নে এরকম কয়েকটির উদাহরণ দেয়া হলো–

১. **পাতা কাঁটা বা শল্কপত্রে রূপান্তর :** মরুজ উদ্ভিদ যেমন– ফনিমনসা ও ক্যাকটাস প্রস্বেদন হ্রাসের জন্য এদের পাতাগুলো কাঁটা ও শল্কপত্রে রূপান্তরিত হয়।

২. **ঘনসন্নিবিষ্ট পাতা :** অনেক উদ্ভিদদেহে প্রস্বেদন হার কমানোর জন্য পাতাগুলো খুব ঘনসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করে।

৩. **পত্রঝরা :** শীতকালে মাটিতে পানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এ সময় অনেক উদ্ভিদের পাতা ঝরে যায়। যেমন– শাল, সেগুন, মেহগনি, কড়ই ইত্যাদি।

৪. **রোমের আবরণ :** প্রস্বেদন হ্রাস করার জন্য কিছু উদ্ভিদের পাতার উপর ঘন রোমের আবরণ থাকে।

৫. **কিউটিকলের আবরণ :** পাতায় স্নেহ পদার্থ কিউটিন নির্মিত পুরু কিউটিকলের আবরণ থাকাতে অনেক উদ্ভিদের প্রস্বেদন কম হয়।

৬. **ডুবন্ত পত্ররন্ধ্র :** মরুজ উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র গর্তের মধ্যে ডুবন্ত থাকে, এতে প্রস্বেদন হার হ্রাস পায়।

৭. **মোম ও রেজিনের আবরণ :** স্বাভাবিক প্রস্বেদন রোধ করার জন্য পাতার উপর মোম বা রেজিনের আবরণ দেখা যায়।

ব্যবহারিক

পত্ররন্ধ্রের গঠন পর্যবেক্ষণ

উপকরণ : একটি কচি যে কোন বিষমপৃষ্ঠ পাতা, অণুবীক্ষণযন্ত্র, একটি চিমটে, নিডল, একটি স্লাইড, একটি ওয়াচ গ্লাস, ড্রপার, একটি তুলি, একটি কভার স্লিপ, পরিমাণমত পানি, স্যাফ্রানিন ও ডাইলুট গ্লিসারিন।

পদ্ধতি : পাতার উপর পৃষ্ঠে নিডলের (সূঁচ) সাহায্যে আঁচর দিয়ে চিমটে দিয়ে পাতার উপরের ত্বক বিচ্ছিন্ন করে পানিপূর্ণ ওয়াচ গ্লাসে রাখতে হবে। এর পর এতে সামান্য স্যাফ্রানিন দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে সেখান থেকে তুলে স্লাইডে এক/দুই ফোটা ডাইল্যুট গ্লিসারিন দিয়ে তার উপর পাতলা ত্বকটি রাখতে হবে এবং কভার স্লিপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নিডল দিয়ে কভার স্লিপের উপর অল্প চাপ দিয়ে অতিরিক্ত পানি বের করে দিয়ে ব্লটিং পেপার দিয়ে চুষে নিতে হবে। এর পর মাউন্ট করা স্লাইডটিকে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রেখে প্রথমে কম ও পরে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অবজেকটিভে পাতার পত্ররন্ধ্র পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে পাতার পাতলা ত্বকটিতে দেখা যাবে বিশ কিছু পত্ররন্ধ্র। প্রতিটি পত্ররন্ধ্রের গঠনে দেখা যাবে কেন্দ্রে একটি ছিদ্র বা **রন্ধ্র**। রন্ধ্রকে বেষ্টন করে দুটি **অর্ধচন্দ্রাকার রক্ষীকোষ** বা **গার্ড সেল**। রক্ষীকোষ দুটির প্রাচীরের পুরুত্ব সবদিকে সমান নয়। রন্ধ্রের দিকে প্রাচীর বেশি পুরু এবং বাইরের দিকের প্রাচীরটি পাতলা।

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অবজেকটিভে দেখা যাবে রক্ষীকোষের মধ্যে ঘন সাইটোপ্লাজম, একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস এবং কতগুলো ক্লোরোপ্লাস্টিড।

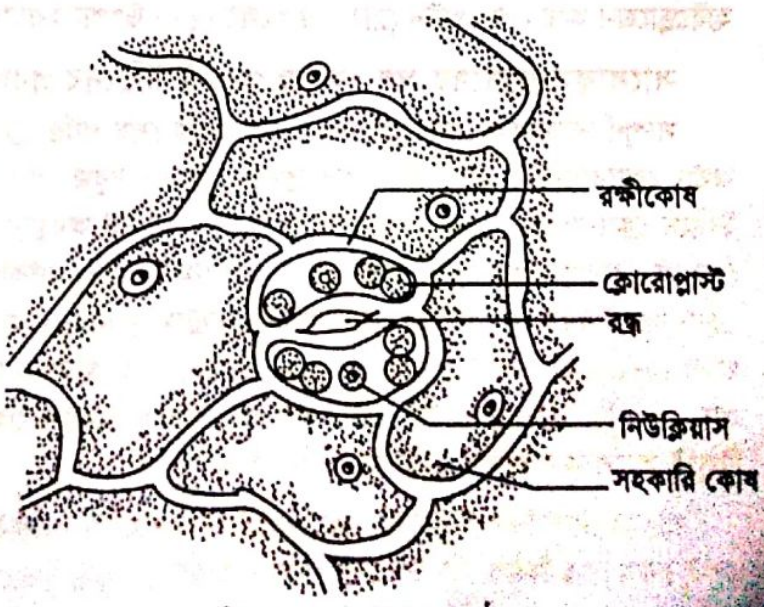

চিত্র ৯.২.৭ : পত্ররন্ধ্রের গঠন

৯.৩ : সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিন্থেসিস (Photosynthesis)

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী চার্লস বার্নেস (Charles Barnes) ফটোসিন্থেসিস (Photosynthesis) শব্দটি প্রথম প্রবর্তন করেন। Photosynthesis শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ *photos* অর্থাৎ আলো এবং *synthesis* অর্থাৎ সংশ্লেষ থেকে এসেছে। ফটোসিন্থেসিস শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো আলোকের উপস্থিতিতে সংশ্লেষণ অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক আলোকের উপস্থিতিতে শর্করা সংশ্লেষ। সালোকসংশ্লেষণ ক্লোরোফিলযুক্ত জীবের, মূলত সবুজ উদ্ভিদের, একটি স্বতন্ত্র শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা অন্য কোনো জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য সূর্যালোক, CO_2, পানি ও ক্লোরোফিল-এর প্রয়োজন হয়। প্রক্রিয়াশেষে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) ও O_2 উৎপন্ন হয়। কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য CO_2 ব্যবহৃত হয় আর পানি ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক শক্তি হিসেবে NADPH + H^+ তৈরির জন্য। শক্তির জন্য প্রয়োজন হয় সূর্যালোকের এবং সূর্যশক্তিকে শোষণ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হয় ক্লোরোফিলের।

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদকোষে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে পরিবেশ থেকে শোষিত পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরল শর্করা (গ্লুকোজ) সংশ্লেষিত হয় এবং উৎপন্ন খাদ্যে সৌরশক্তির আবদ্ধকরণ ঘটে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। এ প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে O_2 নির্গত হয়।

শক্তিবিদ্যার দৃষ্টিতে বলা যায়- **যে পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদ আলোকের ফোটন কণা শোষণ করে আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে জৈব যৌগে আবদ্ধ করে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।**

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ১ অণু হেক্সোজ শর্করা প্রস্তুত করতে ৬ অণু CO_2 ও ১২ অণু H_2O প্রয়োজন পড়ে এবং ৫০-৬০ ফোটন কণা ব্যবহৃত হয়। এখানে H_2O থেকে একদিকে যেমন O_2 মুক্ত হয় অন্যদিকে তেমনি CO_2 -এর সাথে হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়। সালোকসংশ্লেষণ একটি জটিল জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষপর্যন্ত অনেক এনজাইমের সাহায্যে ধারাবাহিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে।

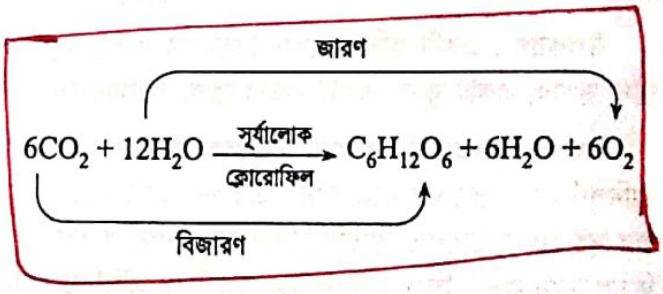

পানির সালোকবিভাজন (Photolysis of water) : আলোর উপস্থিতিতে পানি (H_2O) ভেঙ্গে অক্সিজেন (O_2), হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন ($2H^+$) ও ইলেক্ট্রন (e^-) উৎপন্ন হওয়াকে পানির **সালোকবিভাজন** বলে।

সালোকসংশ্লেষণের অঙ্গ : সবুজ পাতাই উদ্ভিদের প্রধান সালোকসংশ্লেষী অঙ্গ

সম্পূর্ণ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **ক্লোরোপ্লাস্ট** নামক সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুতেই ঘটে। অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্টই হলো সালোকসংশ্লেষণের স্থান। সবুজ শৈবাল, মসবর্গীয়, ফার্নবর্গীয়, নগ্নবীজী এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে এবং বর্ণকণিকাগুলো এখানেই অবস্থান করে। কিন্তু সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে এবং অন্য কিছু শৈবালে (বাদামি শৈবাল, লোহিত শৈবাল, ডায়াটম ইত্যাদি) বর্ণকণিকাগুলো **ক্রোম্যাটোফোর**-এ অবস্থান করে, এদের ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। পাতার ক্লোরোপ্লাস্টের **স্ট্রোমা** (stroma)-য় সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার বিক্রিয়াগুলো ঘটে এবং **গ্রানা** (grana)-র **কোয়ান্টোজোম** (quantosome)- এ আলোক বিক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়। কোয়ান্টোজোমের মধ্যে প্রায় ২৫০ টি ক্লোরোফিল অণু, এনজাইম ও একাধিক ইলেক্ট্রন বাহক এবং অন্যান্য রঞ্জক থাকে। **পাতার মেসোফিল টিস্যুই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান।**

পাতার মেসোফিল টিস্যুতেই ক্লোরোপ্লাস্ট বিন্যস্ত থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় মেসোফিল কোষগুলো প্রায় একই রকম কিন্তু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় মেসোফিল টিস্যু দুভাগে বিভক্ত- উপরের ত্বকের দিকে ঘনভাবে সন্নিবেশিত

লম্বা লম্বা কোষের প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং নিচের ত্বকের দিকে ফাঁক ফাঁকভাবে অবস্থিত গোলাকার কোষের স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা। পাতার নিচের ত্বকে অনেক পত্ররন্ধ্র থাকে।

নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ যেমন-শৈবাল, থ্যালয়েড ব্রায়োফাইট ইত্যাদির সমগ্র দেহেই ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কেবল কচি কান্ড ও পাতায় ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। পাতার প্রসারিত তল অধিক পরিমাণ সূর্যালোক শোষণ করতে সক্ষম। পাতার নিচের ত্বকে অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকায় বাতাস থেকে খুব সহজেই CO_2 গ্রহণ করতে পারে। পাতার প্রাচীর পাতলা হওয়ায় CO_2 গ্যাস পত্ররন্ধ্র থেকে সহজেই মেসোফিল টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পাতার শিরাবিন্যাস সহজেই পাতার কোষগুলোতে প্রচুর পরিমাণ পানি সরবারহ করতে পারে। এসব কারণে উদ্ভিদের সবুজ পাতাকেই প্রধান সালোকসংশ্লেষী অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

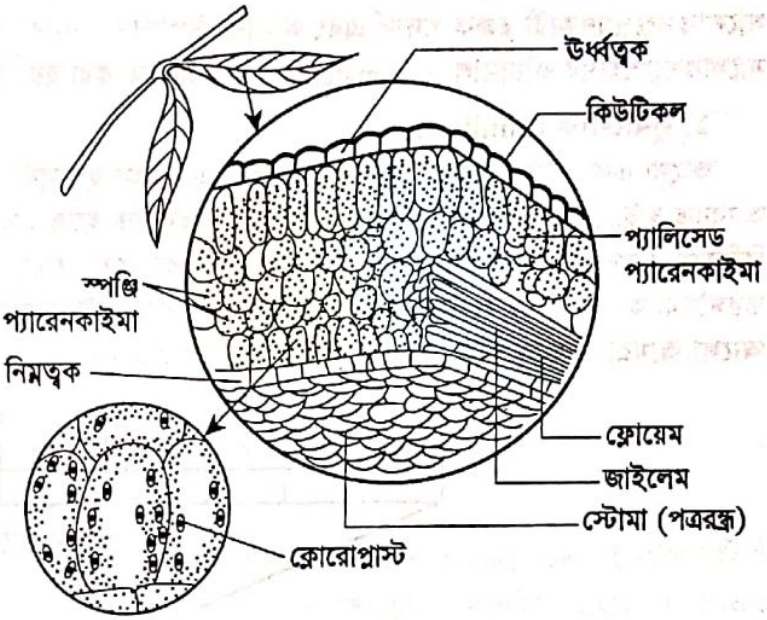

চিত্র ৯.৩.২ : পাতার প্রস্থচ্ছেদে সালোকসংশ্লেষণকারী অঙ্গ দেখানো হয়েছে

সালোকসংশ্লেষণ অঙ্গ : উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ, বিশেষত সবুজ পাতা।
সালোকসংশ্লেষণ অঙ্গাণু : ক্লোরোপ্লাস্ট।
সালোকসংশ্লেষণ-এর স্থান : ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েড।

সালোকসংশ্লেষণের সময়

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অর্থাৎ দিনের বেলায় ঘটে, তবে উপযুক্ত তীব্রতাসম্পন্ন কৃত্রিম আলোতেও কমবেশি সালোকসংশ্লেষণ সম্পন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতির আলোক বিক্রিয়ার জন্য আলোর উপস্থিতি অপরিহার্য। তবে অন্ধকার বিক্রিয়ার জন্য আলোর উপস্থিতি অপরিহার্য নয়, কারণ এ বিক্রিয়াগুলো আলোর অনুপস্থিতিতেও সম্পন্ন হয়।

সালোকসংশ্লেষণকারী জীব

১. সালোকসংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ : সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জকযুক্ত ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, নীলাভ সবুজ শৈবাল এবং সকল ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদ।

২. সালোকসংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ মূল : গুলঞ্চের আত্তীকরণ মূল, অর্কিডের বায়বীয় মূল।

৩. সালোকসংশ্লেষণকারী কান্ড : ফণীমনসার পর্ণকান্ড, কচি কান্ড, ক্লোরোফিলযুক্ত সকল উদ্ভিদ কান্ড, যেমন- পুঁই, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি।

৪. সালোকসংশ্লেষণকারী এককোষী জীব: ইউগ্লেনা (*Euglena*), ক্রাইস্যামিবা (*Crysamoeba*) প্রভৃতি ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত জীব।

৫. সালোকসংশ্লেষণে অক্ষম উদ্ভিদ : সকল শ্রেণির ছত্রাক, ক্লোরোফিলবিহীন পূর্ণ পরজীবী ও পূর্ণ মৃতজীবী উদ্ভিদ।

CamScanner

সালোকসংশ্লেষণের প্রধান উপাদানসমূহ

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান উপাদানগুলো হলো- **আলো, পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালোকসংশ্লেষণকারী রঞ্জক পদার্থ** এবং অন্যান্য উপাদান। এসব উপাদানের মধ্যে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল (raw materials) বলে চিহ্নিত করা হয়। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হল।

১. সূর্যালোক (Sunlight)

আলো এক ধরনের তড়িৎ- চুম্বকীয় বিকিরণ। এর উৎস হল সূর্য। সূর্য একটি বিরাট উত্তপ্ত পরমাণু চুল্লি। এখানে অনবরত হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। সূর্যের উত্তপ্ত কেন্দ্রের হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরের সময় যে শক্তি বিকিরিত হয়, তাকে ফোটন কণা বলে। এক্স-রে ও গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম এবং ইনফ্রারেড ও রেডিও-রে-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক বেশি। **আলোর তরঙ্গের শুধুমাত্র দৃশ্যমান** আলো আমরা দেখতে পাই যা সাদা আলো নামে পরিচিত।

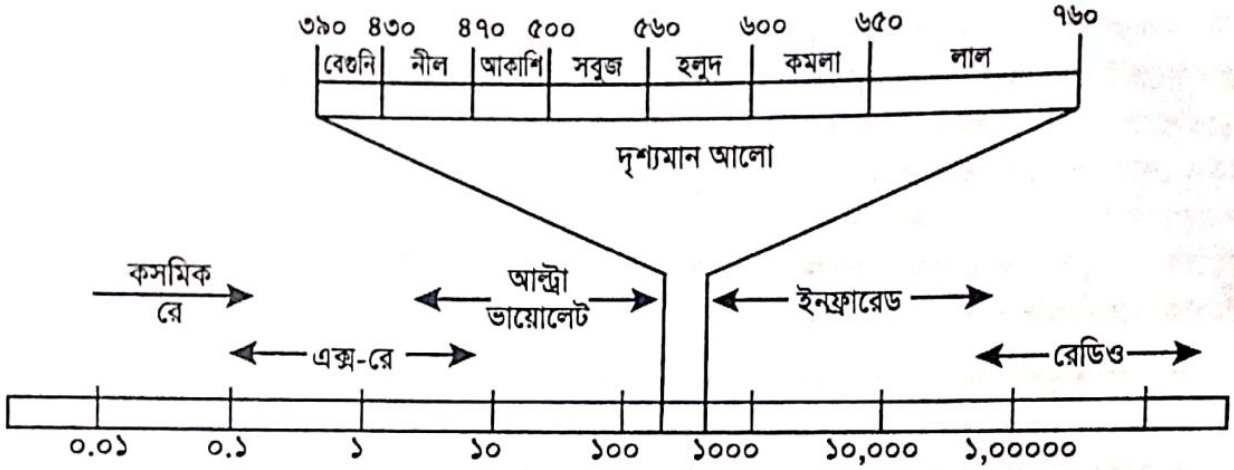

চিত্র ৯.৩.৩ : সূর্যালোকের বিভিন্ন বর্ণ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য

আলোর বর্ণালি (Light spectrum) : দৃশ্যমান আলো অনেকগুলো তরঙ্গের (spectra) সমষ্টি মাত্র। দৃশ্যমান আলোর প্রকৃতি বোঝানোর জন্য যে এককে প্রকাশ করা হয় তাকে **ন্যানোমিটার** (nanometer = nm; 1 nm = 10^{-9} m) বলে। দৃশ্যমান আলো একটি প্রিজম- এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করানো হলে অন্তস্থ যে তড়িৎতরঙ্গ রয়েছে তা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এর মধ্যে মোট সাত ধরনের তড়িৎতরঙ্গ রয়েছে যার সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য হলো ৩৯০ nm এবং সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৭৬০ nm। এসব তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌছালে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রঙে ধরা পড়ে। এগুলো হল- বেগুনি (violet), নীল (indigo), নীলাভ-সবুজ বা আকাশি (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange) এবং লাল (red)। এগুলোর আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষিপ্ত নাম **বেনিআসহকলা** বা VIBGYOR হয়েছে। একে **আলোর বর্ণালি** বলে।

আলোর শোষণ বর্ণালি (Absorption spectrum) : আলো কোনো বস্তুর উপর পতিত হলে তার কিছু অংশ শোষিত হয়। বস্তুর উপর পতিত আলোর বিভিন্ন আলোক তরঙ্গের যে পরিমাণ শোষিত হয়, তাকে **শোষণ বর্ণালি** বলে। আপতিত সূর্যালোকের ৮৩% ক্লোরোপ্লাস্ট কর্তৃক শোষিত হয়, ১২% বায়ুমন্ডলে প্রতিফলিত হয় এবং বাকি ৫% ভূগর্ভে প্রতিসরিত বা বিলীন হয়। পাতায় শোষিত সৌররশ্মির মোট পরিমাণের মাত্র ০.৫- ৩.৫% ক্লোরোফিল ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ কর্তৃক শোষিত হয়।

আলোর কার্যকর বর্ণালি (Action spectrum) : ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় আলোর কার্যক্ষমতাকে বলা হয় কার্যকর বর্ণালি। সালোকসংশ্লেষণের সময় **বেগুনি-নীল** ও **কমলা-লাল** আলো বেশি ব্যবহৃত হয় এবং বাকি আলো অত্যন্ত কম ব্যবহৃত হয়। একক আলো হিসেবে **লাল আলোতে** সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়, তা প্রমাণিত হয়েছে।

CamScanner

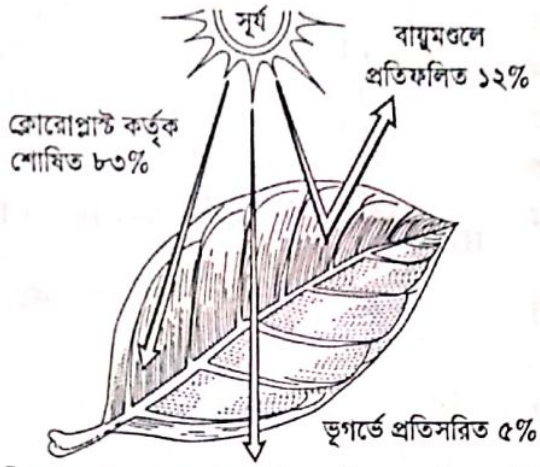

চিত্র ৯.৩.৪ : পাতায় আপতিত সূর্যালোক ও তার পরিণতি

আলোকরশ্মি	ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
বেগুনি (Violent)	390 - 430nm
নীল (Indigo)	430 - 470nm
আকাশি (Blue)	470 - 500nm
সবুজ (Green)	500 - 560nm
হলুদ (Yellow)	560 - 600nm
কমলা (Orange)	600 - 650nm
লাল (Red)	650 - 760nm

২. পানি (Water)

সালোকসংশ্লেষণে পানি নিচে বর্ণিত ভূমিকা পালন করে, যেমন-

i. সূর্যালোকের প্রভাবে সক্রিয় ক্লোরোফিল পানিকে H^+ ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট করে এবং পানির ইলেক্ট্রন সক্রিয় ক্লোরোফিল গ্রহণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণে বিজারিত $NADP + H^+$-এর ইলেক্ট্রনের উৎস হলো পানি।

ii. অক্সিজেন উৎপাদন করে।

iii. NADP কে বিজারিত করে $NADP + H^+$ গঠনে সাহায্য করে।

iv. $NADP + H^+$ থেকে পানির হাইড্রোজেন অংশ উৎপন্ন শর্করার উপাদান হিসেবে আবদ্ধ হয়।

৩. কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide)

স্থলজ উদ্ভিদে বায়ু থেকে CO_2 গ্যাস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্র দিয়ে পাতার ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে অন্তঃকোষীয় স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে আবার ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মেসোফিল টিস্যু কোষে যায়। পত্ররন্ধ্র ছাড়া কিউটিকলের মধ্য দিয়েও CO_2 গ্যাস পাতায় পৌঁছায়। সম্পূর্ণ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ পানিতে দ্রবীভূত CO_2 সমস্ত দেহে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণ করে। আবার অনেকগুলো জলজ উদ্ভিদ যাদের উপরের অংশ পানিতে ভাসে, স্থলজ উদ্ভিদের মতো পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে এবং কিউটিকলের সাহায্যে CO_2 শোষণ করে।

স্থলজ উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল টিস্যুর পানির সঙ্গে CO_2 বিক্রিয়া করে **কার্বনিক এসিড** তৈরি করে ($H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3$)। সূর্যালোকের প্রভাবে কার্বনিক এসিড বিয়োজিত হয়ে আবার CO_2 ও পানিতে পরিণত হয়। এই CO_2 সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। CO_2 বিজারিত হয় এবং কার্বন অংশটি উৎপন্ন শর্করার উপাদান হিসেবে আবদ্ধ হয়।

৪. রঞ্জক পদার্থ

যেসব রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষণে জড়িত সেগুলো হচ্ছে- **ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েডস ও ফাইকোবিলিনস**।

ক. ক্লোরোফিল (Chlorophyll) : ক্লোরোপ্লাস্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণকণিকা হল **ক্লোরোফিল**। আর এ ক্লোরোফিলই সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণকারী প্রধান রঞ্জক পদার্থ। এছাড়াও **ক্যারোটিনয়েডস** (ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল) এবং **ফাইকোবিলিনস** (ফাইকোসায়ানিন ও ফাইকোইরিথ্রিন) ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। গঠন অনুসারে ক্লোরোফিল অণু পাঁচ প্রকার। যথা- ক্লোরোফিল a, b, c, d, e। এছাড়াও **ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল** (ব্যাকটেরিয়াতে Van Niel, 1932 সালে আবিষ্কার করেন), ক্লোরোবিয়ামে ক্লোরোফিল- 650 ও ক্লোরোফিল- 660 ইত্যাদি নামক ক্লোরোফিল

রয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের ক্লোরোফিলের মধ্যে সবুজ শৈবাল ও উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের মধ্যে Chl 'a' ও Chl 'b' একসাথে থাকে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, Chl 'a' একমাত্র রঞ্জক, যার শোষিত আলোকশক্তি সালোকসংশ্লেষণে কাজে লাগে এবং অন্যান্য রঞ্জক তাদের শোষিত আলোকশক্তি Chl 'a'- কে প্রদান করে সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে। Chl 'a' প্রধানত দুই প্রকার, যথা-

১. **Chl 'a' 673 :** এটি 673 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে।

২. **Chl 'a' 683 :** এটি 683 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে।

এছাড়াও দুটি প্রতিক্রিয় রঞ্জক (reactive pigment) রয়েছে। যথা-

P 700 : এটি বিশেষ ধরনের Chl 'a' যা 700 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে।

P 680 : এটি বিশেষ ধরনের Chl 'a' যা 680 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে।

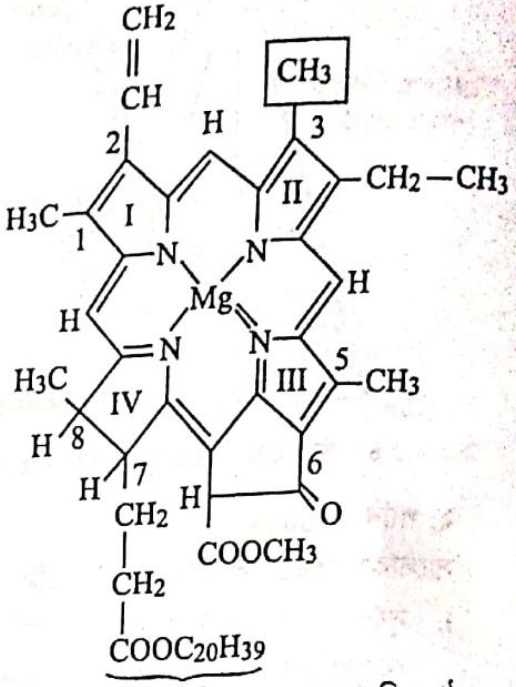

চিত্র ৯.৩.৫ : ক্লোরোফিল-a এর রাসায়নিক গঠন

কয়েক প্রকার ক্লোরোফিলের রাসায়নিক সংকেত	
❑ ক্লোরোফিল- a	$C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$
❑ ক্লোরোফিল- b	$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$
❑ ক্লোরোফিল- c	$C_{35}H_{30}O_5N_4Mg$
❑ ক্লোরোফিল- d	$C_{54}H_{70}O_6N_4Mg$

খ. ক্যারোটিনয়েডস (Carotenoids) : উদ্ভিদে লাল, হলুদ, কমলা, বাদামি প্রভৃতি বর্ণের যে সব রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিলের সাথে যুক্ত হয়ে সহায়ক রঞ্জক পদার্থ হিসেবে কাজ করে, তাদের একত্রে **ক্যারোটিনয়েডস** বলে।

রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে এদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– **ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল**।

❑ **ক্যারোটিন (Carotene)**

i. ক্যারোটিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যার রাসায়নিক সংকেত $C_{40}H_{56}O$।

ii. উদ্ভিদে প্রধানত a, b, g এ d চার ধরনের ক্যারোটিন পাওয়া যায়।

iii. ক্যারোটিন নীলচে বেগুনি আলো (449 nm – 478 nm) সর্বাধিক শোষণ করে।

iv. ক্যারোটিনের বর্ণ বৈচিত্র্য সবচেয়ে আকর্ষণীয়। টমাটোতে লাল, গাজরে লালচে কমলা, বিভিন্ন ফুলে হলুদ, অ্যাভোক্যাডোতে (Avocado; এক ধরনের ফল) সবুজ বর্ণের ক্যারোটিন পাওয়া যায়।

❑ **জ্যান্থোফিল (Xanthophyll)**

i. অক্সিজেনযুক্ত ক্যারোটিনকেই **জ্যান্থোফিল** বলে। জ্যান্থোফিলের রাসায়নিক সংকেত $C_{40}H_{56}O_2$।

ii. **লিউটিন** (lutein) নামক জ্যান্থোফিল সবুজ উদ্ভিদে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যা a-ক্যারোটিনের জারণের ফলে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া টমাটোতে **লাইকোজ্যান্থিন** ও ভুট্টায় **জিয়াজ্যান্থিন** পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণির শৈবালে অন্তত বিশ ধরনের জ্যান্থোফিল পাওয়া যায়।

গ. ফাইকোবিলিন : (Phycobilin; *phyco* = শৈবাল এবং *bilin* পিত্ত) **: ফাইকোবিলিন শুধু নীলাভ-সবুজ শৈবাল ও লোহিত শৈবালে** (*Batrachosparmum, Polysiphonia*) পাওয়া যায়। লাল বর্ণের ফাইকোবিলিনকে **ফাইকোএরিথ্রিন**

(phycoerythrin) এবং নীল রঙের ফাইকোবিলিনকে **ফাইকোসায়ানিন** (phycocyanin) বলে। ফাইকোএরিথ্রিনের রাসায়নিক সংকেত $C_{34}H_{46}O_8N_4$ এবং ফাইকোসায়ানিনের রাসায়নিক সংকেত $C_{34}H_{44}O_8N_4$। ফাইকোএরিথ্রিন প্রধানত নীলাভ-সবুজ বর্ণের এবং ফাইকোসায়ানিন কমলা বর্ণের আলো শোষণ করে।

ফাইকোবিলিনের কাজ : বিভিন্ন শৈবাল গভীর পানিতে বসবাস করে যেখানে আলোর তীব্রতা কম হওয়ায় ক্লোরোফিল পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। কিন্তু ফাইকোবিলিন পানির গভীরেও আলোক শোষণ করে ক্লোরোফিল-a-তে সঞ্চালিত করে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে। এ কারণে ফাইকোবিলিনকে **সহায়ক রঞ্জক পদার্থ** বলে। ফাইকোবিলিন তিন শ্রেণির এবং মোট সাত প্রকার।

৫. অন্যান্য উপাদান (Other components)

ক. থাইলাকয়েড ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা চেইন (TETS or TETC) : ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েড মেমব্রেনে কিছু সংখ্যক ইলেক্ট্রন বাহক সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত হয়ে ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা চেইন অথবা ইলেক্ট্রন প্রবাহতন্ত্র গঠন করে। বাহকগুলো নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে অবস্থান করে।

ফিয়োফাইটিন (Pheophytin = Ph) : এটি একটি রূপান্তরিত ক্লোরোফিল a-অণু (Mg বিহীন)। পরবর্তী বাহক প্লাস্টোকুইনোনের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে।

প্লাস্টোকুইনোন (Plastoquinone = Cyt) : এটি একটি চলনশীল অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতির লিপিড যা থাইলাকয়েড মেমব্রেনে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে।

সাইট্রোক্রোম (Cytochrome = Cyt) : এটি লৌহঘটিত হিম (heme) গ্রুপবিশিষ্ট প্রোটিন। হিম গ্রুপের লৌহ ইলেক্ট্রন আদান-প্রদান করে।

প্লাস্টোসায়ানিন (Plastocyamin = PC) : এটি একটি অত্যন্ত চলনশীল mobile ক্ষুদ্র মেমব্রেন প্রোটিন, যা মুক্তভাবে থাইলাকয়েড প্রকোষ্ঠে চলাচল করতে পারে। এর ইলেক্ট্রন গ্রহীতা গ্রুপ হল কপার।

ফেরিডক্সিন (Ferredoxin = Fd) : এটি একটি আয়রন সালফার (Fe-S) প্রোটিন। এর লৌহ ইলেক্ট্রন গ্রহণ ও বিতরণ করে।

NADP reductase : এটি একটি ফ্ল্যাভোপ্রোটিন এবং বাউন্ড কো-এনজাইম FAD (Flavin Adenine Dinucleotide)। এর ফ্ল্যাভিন গ্রুপ হলো ইলেক্ট্রন গ্রহীতা।

খ. ATP (Adenosine Triphosphate) : এটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ যা জীবকোষের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। পর্যাপ্ত ইলেক্ট্রন এনার্জির সহায়তায় ATP-ase এনজাইম এর উপস্থিতিতে ADP এর সাথে Pi যুক্ত হয়ে ATP তৈরি হয়।

$$ADP + Pi \xrightarrow{ATP\text{-}ase} ATP + H_2O$$

থাইলাকয়েডের যে সার্ফেস স্ট্রোমার দিকে থাকে সে দিকে ATP তৈরি হয়। ATP অণুতে প্রচুর শক্তি জমা থাকে বলে একে **জৈব মুদ্রা** বা **শক্তি মুদ্রা** (Biological coin or Energy coin) বলে। কোষের শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ সংশ্লেষণ, সক্রিয় পরিবহন, কোষ বিভাজন, সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় ATP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শক্তি সঞ্চয় ও সরবারহের কারণে ATP- কে বিভিন্ন বিশেষণে অভিহিত করা হয়, যেমন- (i) The energy currency of the cell, (ii) A universal energy storage compound; (iii) The coin of the cell's energy transfer; (iv) The universal molecule of energy transfer.

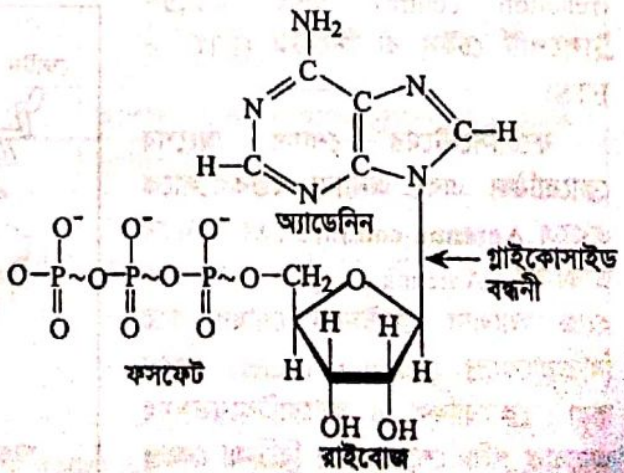

চিত্র ৯.৩.৬ : ATP এর রাসায়নিক গঠন

৩. NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide)

এটি একটি ডিহাইড্রোজিনেজ জাতীয় কো-এনজাইম। পূর্বে একে কো-এনজাইম-I বা ডাইফসফোপাইরিডাইন নিউক্লিওটাইড (diphosphopyridine nucleotide or DPN) বলা হতো। এটি সর্বদা আয়নিত অবস্থায় থাকে বলে এর জারিত অবস্থাকে NAD^+ এবং বিজারিত অবস্থাকে $NADH + H^+$ রূপে চিহ্নিত করা হয়। এর রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ-

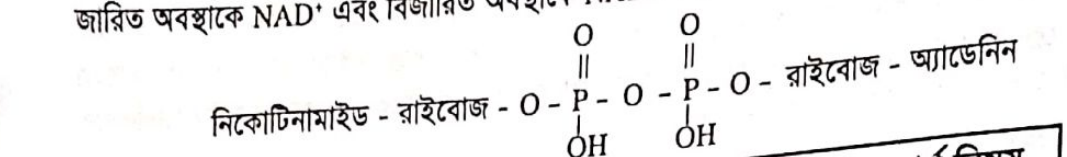

সালোকসংশ্লেষণ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সালোকসংশ্লেষণের দুটি পিগমেন্ট সিস্টেম বা ফটোসিস্টেম (Pigment System or Photosystem)

বিজ্ঞানী রবার্ট এমারসন (Robert Emerson) ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ *Chlorella* নামক শৈবাল-এর ক্লোরোপ্লাস্টের ওপর আলোকরশ্মি প্রয়োগ করে লক্ষ করেন যে 680 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেশি আলোতে সালোকসংশ্লেষণের হার দ্রুত কমতে থাকে। সালোকসংশ্লেষণের হারের অবনতি বর্ণালির লাল অংশে ঘটে বলে তিনি একে **লোহিত চ্যুতি** (red drop) আখ্যা দেন। এমারসন ও ক্যালমার্স (Emerson and Chalmers) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, অতি লাল আলোকের (700 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য) সাথে একযোগে 680 nm এর কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি এক সঙ্গে প্রয়োগ করলে সালোকসংশ্লেষণের হার বাড়ে। দুটি ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি প্রয়োগ করে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধির ঘটনাকে **এমারসন প্রভাব** (Emerson effect) বলে। এ পরীক্ষা থেকে এমারসন ধারণা করেন যে সালোকসংশ্লেষণের আলোক দশার বিক্রিয়া দুটি পৃথক রঞ্জক তন্ত্র বা ফটোসিস্টেম-এর সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেক ফটোসিস্টেমে প্রায় ৪০০ রঞ্জক অণু থাকে। এদের একটি বিক্রিয়া কেন্দ্র (reaction centre) এবং তাকে ঘিরে **আলোক গ্রাহী তন্ত্র বা অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স** (antenna complex) থাকে। একে **অ্যান্টেনা ক্লোরোফিল** (antenna chlorophyll)-ও বলে। এই ক্লোরোফিলের অণুগুলো লেন্সের মতো আলোকশক্তিকে একত্রিভূত করে যে নির্দিষ্ট ক্লোরোফিলে প্রেরণ করে তাকে **বিক্রিয়া কেন্দ্র** (reaction centre) বলা হয়।

ক্লোরোফিল অণুসমূহ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রন গ্রহীতাসমূহ এক সাথে একটি 'ইউনিট' হিসেবে কাজ করে। এই ইউনিটকে **ফটোসিস্টেম** (Photosystem) বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে ফটোসিস্টেম অবস্থান করে এবং প্রতিটি ফটোসিস্টেমে ৪০০টি পর্যন্ত ক্লোরোফিল অণু থাকতে পারে।

প্রতিটি ফটোসিস্টেমের তিনটি অংশ থাকে। যথা- **আলোক শোষণ অংশ** (light harvesting part), **বিক্রিয়া কেন্দ্র** (reaction centre) এবং **ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বা সিস্টেম** (ETC or ETS)।

ফটোসিস্টেমের শোষণ অংশের ক্লোরোফিল এবং অন্যান্য রঞ্জকগুলোকে একত্রে Antenna complex (AC) নামে ডাকা হয়। Antenna complex - এর কাজ হচ্ছে আলোক ফোটনকে শোষণ করে বিক্রিয়াকেন্দ্রে (reaction center) প্রেরণ করা। ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েডসমূহ আলোক শক্তি শোষণ করে বিক্রিয়া কেন্দ্রে প্রদান করে। থাইলাকয়েড মেমব্রেনে দুই ধরনের ফটোসিস্টেম থাকে। যথা-

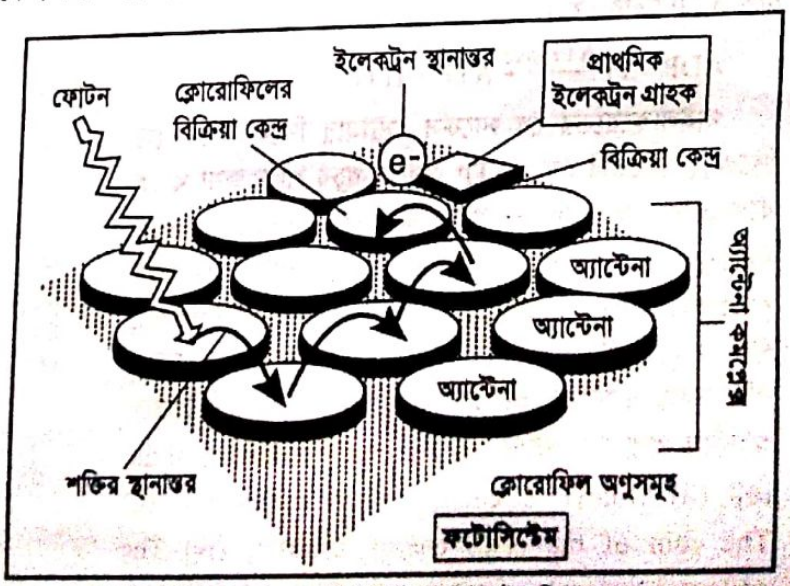

চিত্র ৯.৩.৭ : ফটোসিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ

১. **ফটোসিস্টেম- I (PS- I) :** এটি 680 nm- এর অধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে সক্রিয় হয়।

i. আলোক শোষণ অংশের রঞ্জক হলো- Chl 'a' 683, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল।

ii. বিক্রিয়ার কেন্দ্রে বিশেষ ক্লোরোফিল P 700 এবং সংশ্লিষ্ট প্রোটিন থাকে।

iii. PS- I ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা ল্যামেলীতে এবং গ্রানা ল্যামেলীর বাইরের দিকে অবস্থিত এবং $NADPH+H^+$ গঠনে সাহায্য করে। এখানে ATP synthase-ও থাকে।

২. **ফটোসিস্টেম-II (PS- II) :** এটি অপেক্ষাকৃত কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে সক্রিয় হয়।

i. আলোক শোষণ অংশের রঞ্জক হলো- Chl 'a' 673 ও Chl 'b'.

ii. বিক্রিয়ার কেন্দ্রে বিশেষ ক্লোরোফিল P680 এবং সংশ্লিষ্ট প্রোটিন থাকে।

iii. PS-II ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতর স্ট্রোমার দিকে অবস্থিত, $NADPH+H^+$ গঠনে সাহায্য করে এবং পানিকে ভেঙ্গে O_2 নির্গত করে।

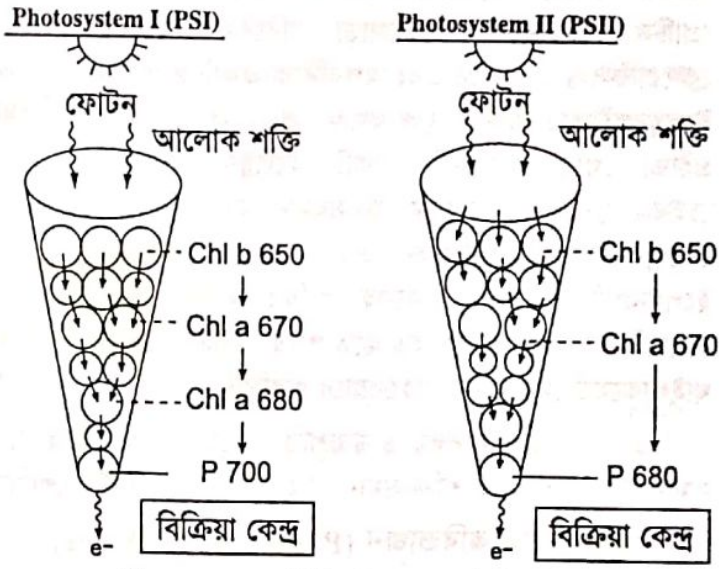

চিত্র ৯.৩.৮ : ফটোসিস্টেম-I ও ফটোসিস্টেম-II

PS-I ও PS-II **ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন** (ETC) দিয়ে যুক্ত থাকে। ETC এর সাইটোক্রোম যৌগ ($Cytb_6/Cytf$), প্লাস্টোকুইনন (PQ), প্লাস্টোসায়ানিন (PC), ফেরিডক্সিন (Fd) ইত্যাদি সমানভাবে থাইলাকয়েড মেমব্রেনের সকল অংশে বিদ্যমান। ধারণা করা হয় যে, প্রতিটি গ্রানামে প্রায় 200 টি PS-I ও PS-II থাকে। PS-I এর পরে PS-II আবিষ্কৃত হয়েছে। যা ৩ বিলিয়ন বছর পূর্বে সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে PS-II সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ফটোসিস্টেম- I এবং ফটোসিস্টেম- II এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ফটোসিস্টেম- I	ফটোসিস্টেম- II
১. অবস্থান	ফটোসিস্টেম-I ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েডের পর্দার বাইরের দিকে অবস্থিত।	ফটোসিস্টেম- II ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েডের পর্দার ভিতরের দিকে অবস্থিত।
২. ক্লোরোফিল	বিক্রিয়াকেন্দ্রে ক্লোরোফিল a-700 থাকে।	বিক্রিয়াকেন্দ্রে ক্লোরোফিল a-680 থাকে।
৩. সম্পর্ক	চক্রীয় এবং অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।	কেবলমাত্র অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৪. ক্লোরোফিলের পরিমাণ	অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ক্লোরোফিল a-থাকে।	অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ক্লোরোফিল a- থাকে।
৫. ফটোলাইসিস	ফটোলাইসিস ঘটে না।	ফটোলাইসিস ঘটে।
৬. NADP	NADP বিজারিত হয়।	NADP বিজারিত হয় না।
৭. অনুপাত	ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েডের অনুপাত 25 : 1।	ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েডের অনুপাত 5 : 1।
৮. রঞ্জক	ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি।	জ্যান্থোফিলের পরিমাণ বেশি।

ফটোসিন্থেটিক ইউনিট (Photosynthetie Unit) : ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে অবস্থিত ফটোসিস্টেমই ফটোসিন্থেটিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে। এতে আলোর ফোটন শোষণ করার জন্য বিভিন্ন রঞ্জক অণু (৩০০- ৪০০ অণু), সক্রিয় অণু ক্লোরোফিল-a; এক গুচ্ছ বিশেষ ধরনের প্রোটিন, ইলেক্ট্রন গ্রহীতা ও ETC গুচ্ছাকারে পাশাপাশি একটি কার্যকরী ইউনিট হিসেবে অবস্থান করে। এক সময় এই ইউনিটকে কোয়ান্টোজোম বলা হতো। কোয়ান্টাম (L. quantus: how great) থেকে কোয়ান্টোজোম এসেছে যার অর্থ শক্তির অবিভাজ্য ইউনিট।

ফটোঅ্যাকটিভেশন (Photoactivation) : পিগমেন্ট অণুর একটি ইলেক্ট্রন আলোক শক্তি শোষণ করে শক্তিকৃত (excited) হওয়াকে বলা হয় **ফটোঅ্যাকটিভেশন**।

বিক্রিয়াকেন্দ্র (Reaction Centre)

ফটোসিস্টেমের একটি বিক্রিয়া কেন্দ্র থাকে। বিক্রিয়া কেন্দ্রে অল্পসংখ্যক প্রোটিন থাকে। প্রতিটি প্রোটিন একদিকে একজোড়া বিশেষ ধরনের ক্লোরোফিল-a এর সাথে এবং অপরদিকে একটি প্রাথমিক ইলেক্ট্রনগ্রহীতার সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রাথমিক ইলেকট্রন গ্রহীতা থেকে ইলেক্ট্রনটি একটি ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন-(ETC) এর মাধ্যমে অগ্রসরমান হয়। বিক্রিয়া কেন্দ্রের বিশেষ ক্লোরোফিল একটি ইলেক্ট্রন প্রাথমিক ইলেক্ট্রনগ্রহীতাকে প্রদান করলেই শোষিত আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। বিক্রিয়া কেন্দ্র থাইলাকয়েড মেমব্রেনের বাইলেয়ারে অবস্থিত।

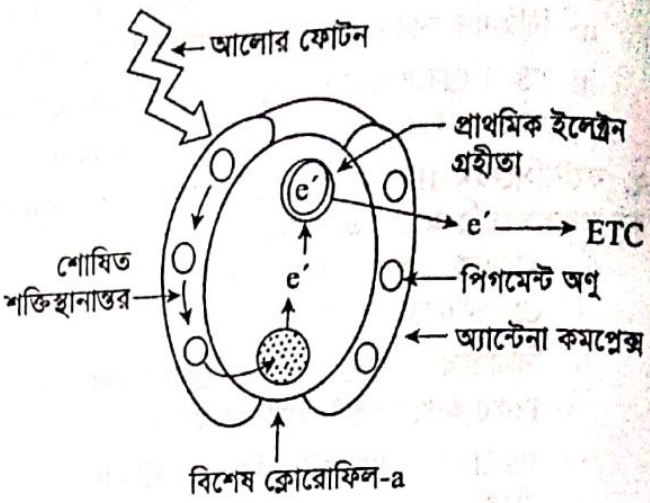

চিত্র ৯.৩.৯ : একটি বিক্রিয়া কেন্দ্র : তীর চিহ্নের মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তর ও ইলেক্ট্রন স্থানান্তর দেখানো হয়েছে।

এটমের নিম্নশক্তি বলয় ও উচ্চশক্তি বলয়ের মাঝে শক্তির যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তা অবশ্যই শোষিত আলোক শক্তির সমান হতে হবে। এই শক্তি সমান না হলে আলোর ফোটন শোষিত হবে না।

পানির সালোকবিভাজন (Photolysis of Water)

ফটোসিস্টেম II (PS II) তে পানি অণুর বিভাজন ঘটে যার ফলে ইলেক্ট্রন (e^-), প্রোটন (H^+) এবং অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। PS II হতে ইলেক্ট্রন বের হয়ে প্রাথমিক ইলেক্ট্রনগ্রহীতায় চলে গেলে P680 অক্সিডাইজড হয় এবং প্রচন্ডভাবে ইলেকট্রোনেগেটিভ হয়। এর ফলে $P680^+$ শক্তি প্রয়োগ করে পানি অণু ভেঙ্গে ইলেক্ট্রন বের করে দিতে পারে। **বায়োলজিতে সবচেয়ে শক্তিশালী অক্সিডেন্ট হলো $P680^+$**। একটি এনজাইম সাব ইউনিট (water splitting enzyme) পানি ভাঙনে সহায়তা করে। এছাড়া Mn^{++} এবং Cl^- আয়নও এতে সহায়তা করে। এটি থাইলাকয়েড মেমব্রেনে প্রকোষ্ঠের দিকে থাকে। এক অণু অক্সিজেন ত্যাগ করতে হলে দুই অণু পানি বিশ্লেষিত হতে হয়, এতে চারটি ইলেক্ট্রন সৃষ্টি হয়।

$$2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$$

PS II হতে একটি ইলেকট্রন ETC দিয়ে প্রবাহিত হয়ে $NADP^+$ পর্যন্ত পৌছাতে আলোর ২টি ফোটনের প্রয়োজন পড়ে। একটি ফোটন শোষণ করে PS II এবং একটি ফোটন শোষণ করে PS I. এটি শুরু হয় পানি অক্সিডেশন ও অক্সিজেন তৈরির মাধ্যমে। প্রতিটি $NADPH + H^+$ তৈরির জন্য ২টি ইলেক্ট্রনের প্রয়োজন হয়।

[শ্বসনে $NADPH + H^+$ থেকে e^- স্বতঃস্ফূর্তভাবে O_2 এ মিলিত হয়ে পানি তৈরি করে। আর সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে শক্তি খরচ করে পানি থেকে ইলেক্ট্রন $NADP^+$ তে যায়। শ্বসনে উচ্চ শক্তির $NADH + H^+$ থেকে অল্প শক্তির পানি তৈরি হয়। আর সালোকসংশ্লেষণ-এ অল্প শক্তির পানি হতে উচ্চ শক্তির $NADPH + H^+$ তৈরি হয়।]

অক্সিজেন (O_2) এবং H^+ উপজাত হিসেবে (by product) উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন বর্জ্যবস্তু তাই পরিবেশে ত্যাজ্য হয়। H^+ প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্ট (proton gradient) তৈরি করে।

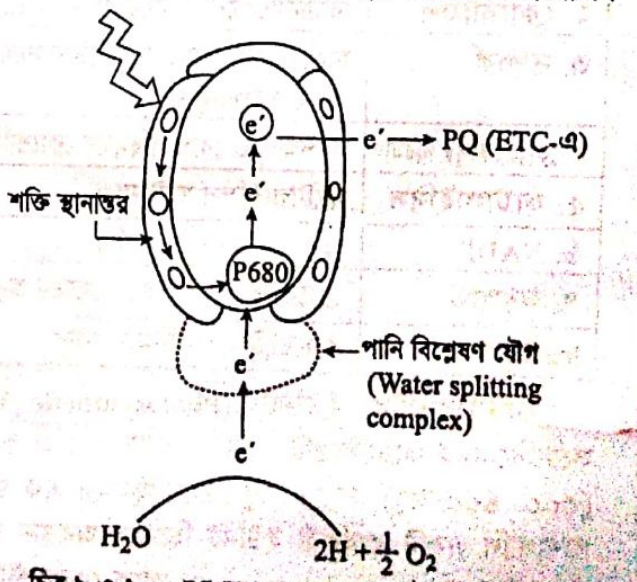

চিত্র ৯.৩.১০ : PS-II (P680) এবং ফটোলাইসিস প্রক্রিয়া

পানির বিভাজন কেবলমাত্র আলোর উপস্থিতিতে ঘটে থাকে তাই এর নাম দেয়া হয়েছে ফটোলাইসিস (Photolysis)।

ফটোলাইসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব

১. এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে মুক্ত হয়। ফলে পরিবেশে O_2 এর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং সমগ্র প্রাণিকুল এই অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল।

২. এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ইলেক্ট্রন (e^-) PS-II এর ইলেক্ট্রন (e^-) এর ঘাটতি পূরণ করে। সূর্যালোক শোষণের পর PS-II এর P680 হতে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেক্ট্রন দুটি ($2e^-$) বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয়ে পুনরায় P680 তে ফিরে আসে না।

৩. এ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রোটন দুটি ($2H^+$) PS-I এর P700 নির্গত ইলেক্ট্রন (e^-) এর সাথে মিলিত হয়ে NADP কে বিজারিত করে $NADPH + H^+$ উৎপন্ন করে।

৪. অর্থাৎ অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ফটোলাইসিসের মাধ্যমে উৎপন্ন ইলেক্ট্রন (e^-) ও প্রোটন (H^+) দ্বারা প্রক্রিয়াটি অনবরত চলতে থাকে এবং সৌরশক্তি ATP ও $NADPH + H^+$ এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই শক্তি দ্বারাই অন্ধকার পর্যায়ে CO_2 বিজারিত হয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।

সালোকসংশ্লেষণে পানি সরবরাহ

উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থান হলো পাতার মেসোফিল টিস্যুর কোষস্থ ক্লোরোপ্লাস্ট। কাজেই পাতার মেসোফিল কোষে অব্যাহত পানি সরবরাহ নিশ্চিত হতে হবে।

উদ্ভিদ তার মূলরোম দিয়ে (কখনো রাইজয়েড দিয়ে) মাটি কণা ফাঁকের কৈশিক পানি শোষণ করে। শোষিত পানি ক্রমান্বয়ে কর্টেক্স পার হয়ে জাইলেম টিস্যুতে পৌছায় এবং শেষ পর্যন্ত কান্ড ও তার শাখা-প্রশাখা পার হয়ে পাতায় পৌছায়। পাতার শিরাবিন্যাসের মাধ্যমে উক্ত পানি সমস্ত পত্রফলকের মেসোফিল টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানত অসমোসিস প্রক্রিয়ায় পানি প্রথমে কোষাভ্যন্তরে এবং শেষ পর্যন্ত ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে। উক্ত পানি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং ফটোলাইসিস (photolysis) তথা সালোক বিভাজনের মাধ্যমে ভেঙে O_2 হিসেবে বায়ুতে নির্গত হয় এবং $2H^+$, NADP কে বিজারিত করে $NADPH + H^+$ সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হয়।

অনেকের মতে,সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া হলো পানির ভাঙ্গন (ফটোলাইসিস), কারণ তা না হলে $NADPH + H^+$ উৎপন্ন হবে না এবং বায়ুতে O_2 আসবে না। আত্তীকরণ শক্তি $NADPH + H^+$ তৈরি না হলে কার্বন বিজারিত হয়ে শর্করা তৈরি হবে না।

পাতার মেসোফিল টিস্যুতে CO_2 এর প্রবেশ

CO_2 সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান, কারণ শর্করা সৃষ্টির প্রধান কাঁচামাল হলো CO_2, সবুজ উদ্ভিদ এটি বায়ু থেকে গ্রহণ করে। বায়ুমন্ডলে ০.০৩৫% CO_2 (বর্তমানে ০.০৪%) থাকে। পাতায় খোলা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বায়ু পত্ররন্ধ্রের পেছনের বায়ুকুঠুরী পর্যন্ত পৌছে থাকে। বায়ুকুঠুরী হতে CO_2 ব্যাপনের মাধ্যমে মেসোফিল টিস্যুর কোষে প্রবেশ করে এবং পরে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।

সূর্যালোকে পত্ররন্ধ্রগুলো দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং CO_2 পত্ররন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। পত্ররন্ধ্র দিয়ে শোষিত CO_2 মেসোফিল টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। পাতার প্যালিসেড ও স্পঞ্জি কোষের পানির সাথে CO_2 মিলিত হয়ে কার্বনিক এসিড প্রস্তুত করে।

$$H_2O + CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3$$
(কার্বনিক এসিড)

সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কোষের কার্বনিক এসিড পুনরায় বিয়োজিত হয়ে CO_2 ও পানিতে পরিণত হয়। CO_2 পরবর্তীকালে সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সূচনা

সূর্যালোকের ফোটন (Photon = আলোক শক্তির ইউনিট) উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গে (প্রধানত পাতা) পতিত হলে অভ্যন্তরস্থ ক্লোরোপ্লাস্টের ক্লোরোফিল অণু তা শোষণ করে সক্রিয় হয়। সক্রিয় ক্লোরোফিল অণুর মাথার ডবল বন্ড থেকে একটি ইলেক্ট্রন শক্তিকৃত হয়ে এটমের নিম্ন বলয় থেকে উচ্চ বলয়ে চলে আসে। এটমে শক্তির উচ্চ বলয় হতে ইলেক্ট্রনটি প্রাথমিক ইলেক্ট্রন গ্রহীতা গ্রহণ করলে সালোকসংশ্লেষণ-এর সূচনা ঘটে।

উচ্চ শক্তি বলয়ে আসা ইলেক্ট্রনের ভাগ্য নিম্নেবর্ণিত তিন প্রকারের যেকোনো এক প্রকার হতে পারে :

১. উচ্চ শক্তি বলয় হতে শক্তি হারিয়ে পুনরায় নিম্নশক্তি বলয়ে ফিরে যাওয়া। এক্ষেত্রে শোষিত শক্তি তাপশক্তি হিসেবে মুক্ত হয় বা ফ্লুরেসেন্স (fluorescence) হিসেবে বিকিরিত হয়। সালোকসংশ্লেষণে এই শক্তি কাজে আসে না।

২. শোষিত শক্তি পাশের কোনো পিগমেন্টের অণুর ইলেক্ট্রনকে দিয়ে উচ্চ বলয়ের ইলেক্ট্রনটি নিম্নশক্তি বলয়ে ফিরে যাওয়া। এক্ষেত্রে শক্তি স্থানান্তর হয়-ইলেক্ট্রন নয়। এভাবেই অ্যান্টেনা কমপ্লেক্সের শোষিত আলোক শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে বিক্রিয়া কেন্দ্রের বিশেষ ক্লোরোফিল a-তে আসে।

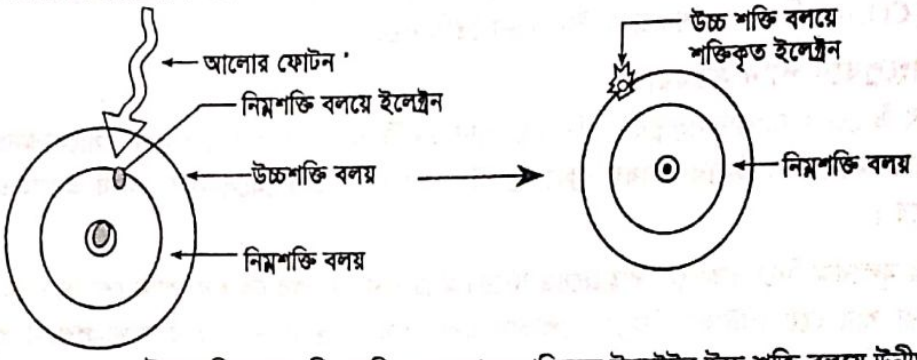

চিত্র ৯.৩.১১ : এটমে শক্তি বলয়: নিম্ন শক্তি বলয় থেকে শক্তিকৃত ইলেক্ট্রন উচ্চ শক্তি বলয়ে উন্নীত

৩. উচ্চশক্তি বলয় হতে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেক্ট্রনটি একটি প্রাথমিক ইলেক্ট্রন গ্রহীতাকে প্রদানে সমর্থ হওয়া। এক্ষেত্রে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেক্ট্রনটি স্থানান্তরিত হয় এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

সালোকসংশ্লেষণের কলাকৌশল (Mechanism of Photosynthesis)

ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান (Blackman, 1905) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে দুটি অধ্যায় বা পর্যায়ে ভাগ করেন। যথা-**আলোকনির্ভর পর্যায়** (Light dependent phase) ও **আলোকনিরপেক্ষ পর্যায়** (Light independent phase)।

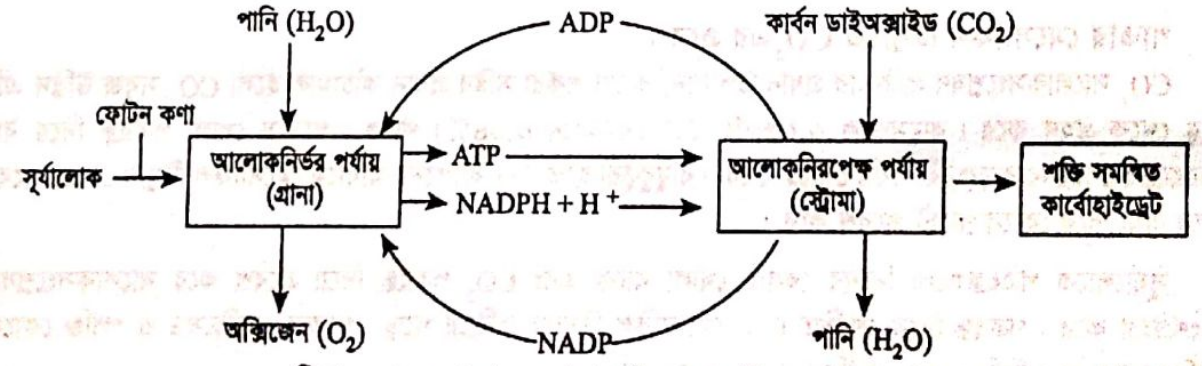

চিত্র ৯.৩.১২ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রেখাচিত্র

১. আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase) : এ পর্যায়ে ATP ও NADPH + H^+ তৈরি হয়।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার যে পর্যায়ে সূর্যের আলোকশক্তি রাসায়নিক স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ATP ও NADPH + H^+ এ সঞ্চারিত হয়, তাকে আলোকনির্ভর পর্যায় বা আলোক দশা (light phase) বলে। এ পর্যায়টি ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েড মেমব্রেনে সংঘটিত হয় এবং এ পর্যায়ের জন্য সূর্যের আলো অপরিহার্য।

এ পর্যায়ে ক্লোরোফিল অণু আলোকরশ্মির ফোটন নামক কণা বা কোয়ান্টা শোষণ করে এবং শোষণকৃত ফোটন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP সৃষ্টি করে। এছাড়া এ অধ্যায়ে H_2O ভেঙে O_2 নির্গত হয় এবং NADP বিজারিত হয়ে NADPH + H^+ তৈরি করে। এ পর্যায়টিকে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায়-

$$2ADP + 2Pi + 2\,NADP + 4\,H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক}} 2ATP + 2NADPH + H^+ + 2\,H_2O + O_2$$

উচ্চশক্তি সম্পন্ন ATP ও NADPH + H^+ সৃষ্টি করতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তা সূর্যালোক থেকে আসে। সূর্যালোকের শক্তিকে ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে। CO_2 আত্তীকরণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুত করতে ATP ও NADPH + H^+ এর শক্তি ব্যবহৃত হয় বলে ATP ও NADPH + H^+ কে আত্তীকরণ শক্তি (assimiltory power) বলে।

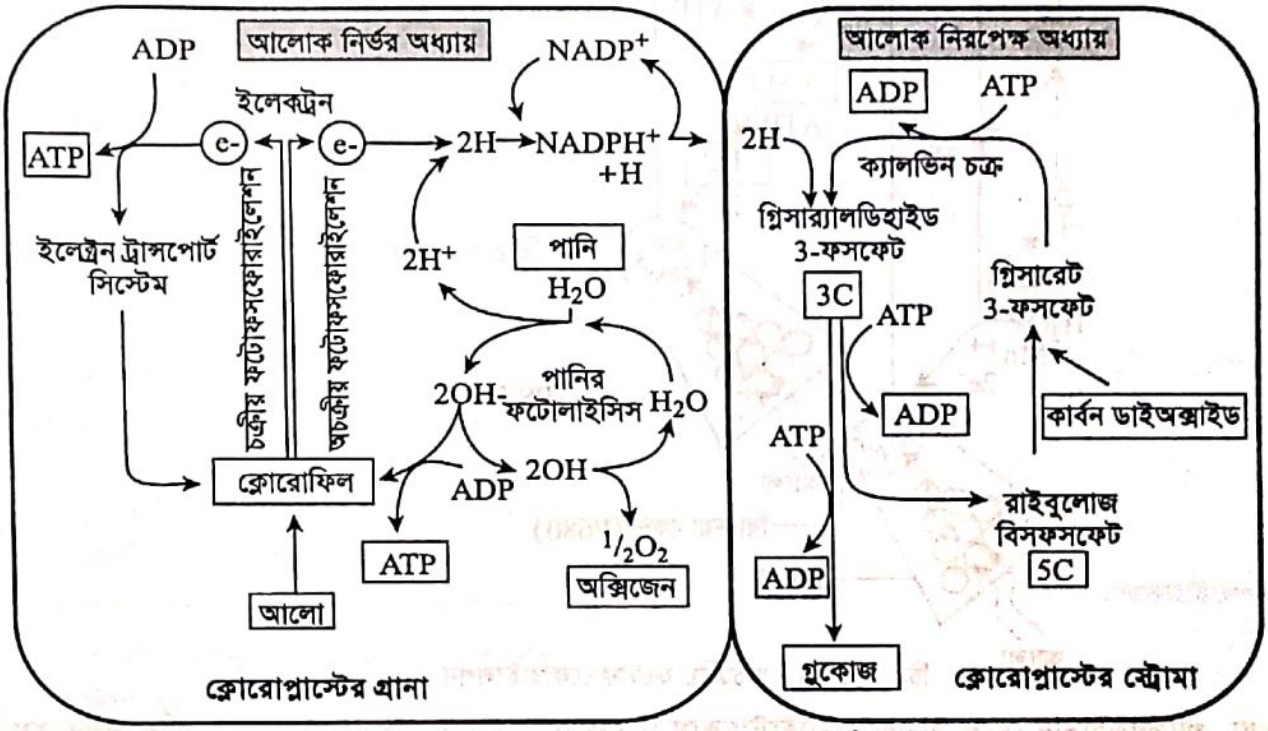

চিত্র ৯.৩.১৩ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সার্বিক প্রক্রিয়া
(সূত্র : Oxford Dictionary of Biology : Tenth Edition, Oxford University Press)

ফটোফসফোরাইলেশন (Photophosphorylation) : কোনো যৌগের সঙ্গে অজৈব ফসফেট যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ফসফোরাইলেশন (phosphorylation) বলে। আর আলোর উপস্থিতিতে ফসফোরাইলেশন ঘটলে তাকে ফটোফসফোরাইলেশন বা ফটোসিনথেটিক ফসফোরাইলেশন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সালোকসংশ্লেষণের সময় আলোকশক্তির সহায়তায় ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) এর সমন্বয়ে ATP সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে। আরনন (Arnon) ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফটোফসফোরাইলেশন ও ইলেকট্রন পরিবহন সম্পর্কে ধারণা দেন। সালোকসংশ্লেষণের সময় দুই ধরনের ফটোফসফোরাইলেশন পরিলক্ষিত হয়। যথা-অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন ও চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন।

ক. অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন (Noncyclic Photophosphorylation)

যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল অণু থেকে উৎক্ষিপ্ত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহকের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার পর NADP এর সাথে যুক্ত হয়, কিন্তু ইলেকট্রন যে ক্লোরোফিল থেকে নির্গত হয়েছিল সেই ক্লোরোফিলে পুনরায় ফিরে না গিয়ে ফটোসিস্টেম-১ এ চলে আসে তাকে অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-১ (PS-I) এবং ফটোসিস্টেম-২ (PS-II) উভয়ই অংশগ্রহণ

করে এবং একটি ইলেক্ট্রন বাহকের শৃঙ্খলের মাধ্যমে এদের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। বিস্তারিত প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত ধাপসমূহে ব্যাখ্যা করা যায়।

i. ফটোসিস্টেম-২ (PS-II) এর ক্লোরোফিল অণু 673nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সূর্যালোক শোষণ করে। শোষিত আলো এক অণু থেকে অপর অণুতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিক্রিয়া কেন্দ্র P680 তে পৌঁছে।

ii. P680 থেকে দুটি ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে প্লাস্টোকুইনোন (PQ) এ প্রবাহিত হয়।

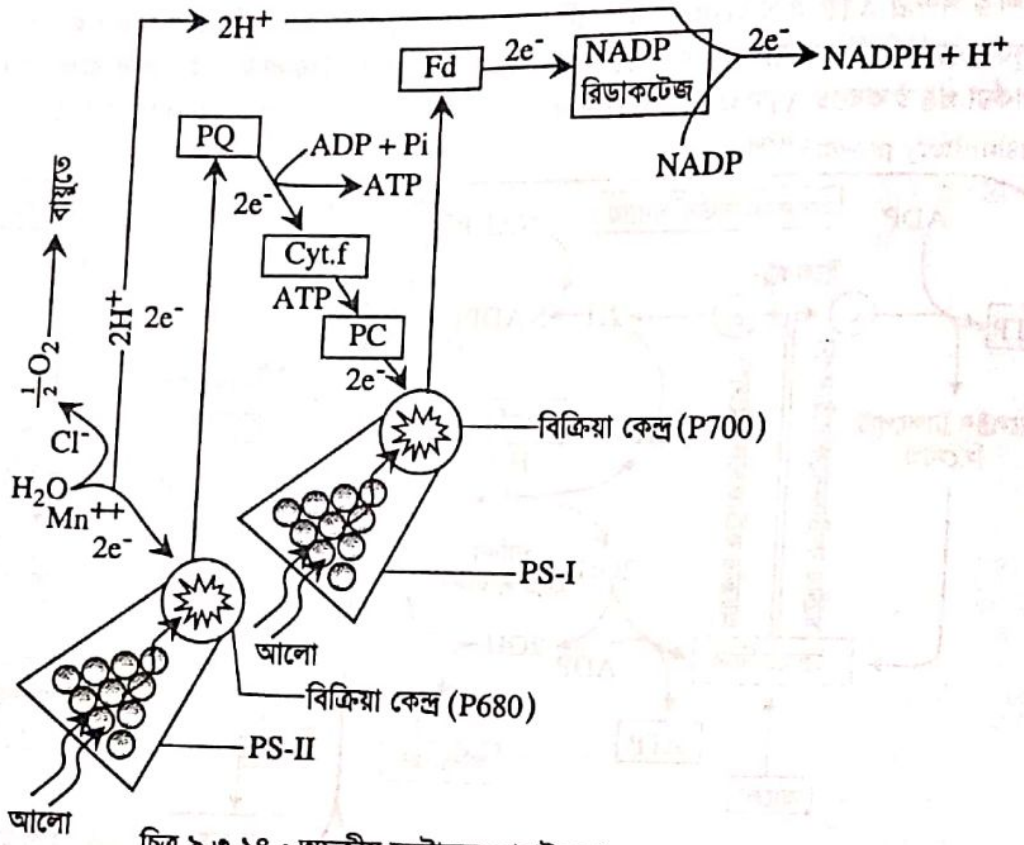

চিত্র ৯.৩.১৪ : অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন

iii. প্লাস্টোকুইনোন থেকে ইলেকট্রন সাইটোক্রোম বিএফ (Cyt.bf) এ যায়। এ ধাপে যে শক্তি নির্গত হয় তা ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) কে যুক্ত করে ATP তৈরি করে।

iv. ইলেকট্রন দুটি সাইটোক্রোম বিএফ থেকে প্লাস্টোসায়ানিন (PC) এ পৌঁছে।

v. প্লাস্টোসায়ানিন ফটোসিস্টেম-১ (PS-I) এর P700 কে ইলেকট্রন প্রদান করে।

vi. P700 থেকে উৎক্ষিপ্ত ২টি ইলেকট্রন ফেরিডক্সিন (Fd) কর্তৃক গৃহীত হয়।

vii. Fd থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে NADP রিডাকটেজ। NADP রিডাকটেজ ২টি ইলেকট্রন (বিক্রিয়ার কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত) এবং দুটি প্রোটন (পানির ভাঙ্গন থেকে) সহযোগে NADP কে বিজারিত করে $NADPH + H^+$ তৈরি করে।

viii. সৃষ্ট $NADPH + H^+$ পরবর্তীকালে CO_2 আত্তীকরণে অংশগ্রহণ করে (আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়ে)।

ফটোসিস্টেম-২ যে ইলেকট্রন হারায় পানি থেকে ইলেকট্রন এসে তা পূরণ করে। কারণ, একই সময়ে Mn^{++} ও Cl^- এর উপস্থিতিতে পানি ভেঙে O_2, ইলেকট্রন (e^-) এবং প্রোটন (H^+) এ বিভক্ত হয়। অক্সিজেন অণু বায়ুতে চলে যায়, ইলেকট্রন ফটোসিস্টেম-২ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং প্রোটন (H^+) NADP কে বিজারিত করে $NADPH + H^+$ সৃষ্টি করে। কাজেই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন নির্গত হয় তা অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন পর্যায়ে পানির ভাঙনের ফলে সৃষ্টি হয়। পানির এরূপ ভাঙনকে পানির সালোকবিভাজন বা ফটোলাইসিস (photolysis) বলে।

খ. চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন (Cyclic Photophosphorylation)

যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি শোষণের ফলে উদ্দীপ্ত ক্লোরোফিল অণু থেকে নির্গত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে নিম্নেজ অবস্থায় পুনরায় ঐ ক্লোরোফিল অণুতে ফিরে আসে এবং একবার পরিভ্রমণ শেষে একটি ATP অণু তৈরি করে, তাকে চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন বলে। নিচে বর্ণিত ধাপসমূহের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

i. এ প্রক্রিয়ায় কেবল ফটোসিস্টেম-১ [PS-I] অংশগ্রহণ করে।

ii. ফটোসিস্টেম-১ [PS-I] এর ক্লোরোফিল অণু 680nm এর বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক শোষণ করে।

iii. ক্লোরোফিল অণু আলোক ফোটন শোষণ করে শক্তিপ্রাপ্ত হয়। এ শক্তি পরে বিক্রিয়া কেন্দ্র, P700 তে স্থানান্তরিত হয়।

iv. উত্তেজিত P700 থেকে ২টি শক্তিপ্রাপ্ত ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফেরিডক্সিন (Fd) এ গমন করে।

iv. ফেরিডক্সিন [Fd] থেকে ইলেকট্রন সাইটোক্রোম বি-৬ (Cyt. b_6) এর মাধ্যমে প্লাস্টোকুইনন (PQ) এ স্থানান্তরিত হয়।

vi. প্লাস্টোকুইনন (PQ) থেকে ইলেকট্রন সাইটোক্রোম-এফ (Cyt. f)এ আসে। এ সময় ইলেকট্রনের মুক্ত শক্তি দিয়ে ADP ও Pi সহযোগে একটি ATP তৈরি হয়।

vii. সাইটোক্রোম-এফ (Cyt. f) থেকে ইলেকট্রন প্লাস্টোসায়ানিন (PC) এর মাধ্যমে পুনরায় P700 তে ফিরে আসে।

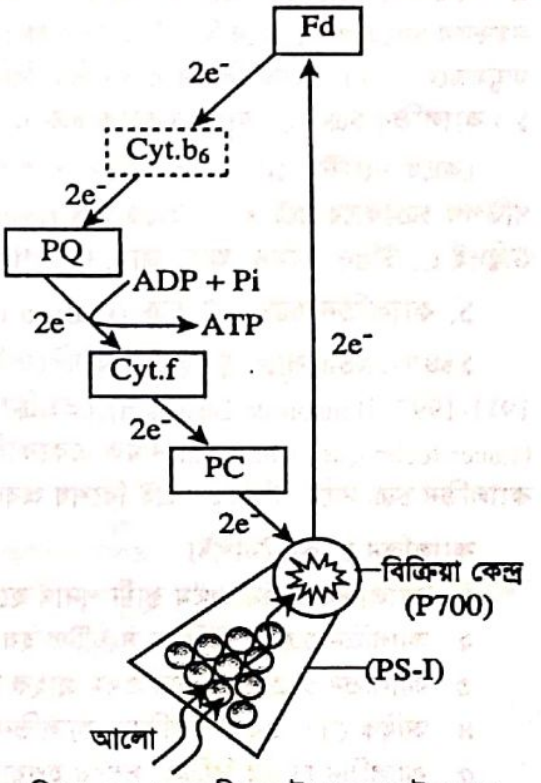

চিত্র ৯.৩.১৫ : চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন

চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন ও অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন	অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন
১. পানির প্রয়োজন	এ প্রক্রিয়ায় পানির প্রয়োজন হয় না।	এ প্রক্রিয়ায় পানির প্রয়োজন হয়।
২. উৎপন্ন দ্রব্য	এ প্রক্রিয়ায় O_2 উৎপন্ন হয় না।	এ প্রক্রিয়ায় O_2 উৎপন্ন হয়।
৩. ইলেকট্রন গ্রহণ ও দান	এ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিলই ইলেকট্রন দাতা ও গ্রহীতার কাজ করে।	এক প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ইলেকট্রন দাতা ও গ্রহীতার কাজ করে।
৪. NADP	এ প্রক্রিয়ায় NADP বিজারিত হয় না।	এ প্রক্রিয়ায় NADP বিজারিত হয়।
৫. ফটোসিস্টেম	এ প্রক্রিয়ায় PS-I কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।	এ প্রক্রিয়ায় PS-I ও PS-II উভয়ই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।
৬. তরঙ্গদৈর্ঘ্য	এ বিক্রিয়ায় দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি অংশগ্রহণ করে।	এ বিক্রিয়ায় ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি অংশগ্রহণ করে।

২. আলোকনিরপেক্ষ পর্যায় (Light Independent Phase) : কার্বোহাইড্রেট তৈরি বা কার্বন বিজারণ পদ্ধতি

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোকনির্ভর পর্যায়ে সৃষ্ট ATP ও NADPH + H^+ এর সহায়তায় CO_2 কে বিজারিত করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয়, তাই এ পর্যায়কে কার্বন বিজারণ গতিপথ বা কার্বোহাইড্রেট তৈরি বা অন্ধকার বিজারণ পর্যায়ও বলা হয়। কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করতে কোথাও আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না বিধায় এ পর্যায়টিকে আলোকনিরপেক্ষ পর্যায় বা অন্ধকার পর্যায়ও বলা হয়। আলোকনিরপেক্ষ অধ্যায়টি দিনে বা রাতে সমভাবে চলতে পারে, তবে দিনেই প্রকৃতপক্ষে বেশি সক্রিয় থাকে। এ পর্যায়টি ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে সংঘটিত হয়। বায়ুমন্ডলের CO_2 থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন বিজারণের তিনটি স্বীকৃত গতিপথ রয়েছে যথা- ১। ক্যালভিন চক্র, ২। হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র ও ৩। CAM (Crassulacean Acid Metabolism) প্রক্রিয়া।

কোষে সংঘটিত মেটাবলিক বিক্রিয়াসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটে থাকে যাকে বলা হয় গতিপথ (pathway)। যে গতিপথ চক্রাকারে ঘটে থাকে তাকে চক্র (cycle) বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই ক্যালভিন চক্র অনুসরণ করে। এসব উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ, যেমন- আম, জাম, ধান, পাট।

১. ক্যালভিন চক্র : C_3 চক্র (Calvin cycle : C_3 cycle)

১৯৪৭-১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালভিন ও তাঁর সহযোগীরা (Melvin Calvin, 1911-1997, Benson & Bassham) তেজস্ক্রিয় কার্বন (^{14}C-কার্বনের আইসোটোপ) ব্যবহার করে সন্ধানী পদ্ধতিতে (tracer technique) *Chlorella* নামক এককোষী শৈবালে কার্বন বিজারণের যে চক্রাকার গতিপথ আবিষ্কার করেন তা ক্যালভিন চক্র নামে পরিচিত। এই বিশেষ অবদানের জন্য বিজ্ঞান ক্যালভিন ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

ক্যালভিন চক্রের বৈশিষ্ট্য

১. ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো 3 কার্বন বিশিষ্ট- 3 ফসফোগ্লিসারিক এসিড।
২. ক্যালভিন চক্র C_3 উদ্ভিদে সংঘটিত হয়।
৩. ক্যালভিন চক্রে CO_2 এর প্রথম গ্রাহক হলো 1,5 রাইবুলোজ বিসফসফেট।
৪. অধিক CO_2 এর উপস্থিতিতে ক্যালভিন চক্র সংঘটিত হয়।
৫. ক্যালভিন চক্রের বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরম উষ্ণতা ১০°-২৫°C।
৬. ক্যালভিন চক্রের বিক্রিয়াসমূহ কেবল মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্টে সংঘটিত হয়।

সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র নিম্নরূপ–

ক. কার্বন যোগ বা কার্বোক্সিলেশন

১. ক্যালভিন চক্রে 5 কার্বনবিশিষ্ট রাইবুলোজ 1.5 বিসফসফেট (RuBP) হচ্ছে CO_2 এর প্রথম গ্রহীতা। রুবিস্কো (rubisco) এনজাইমের কার্যকারিতায় RuBP এর সঙ্গে এক অণু CO_2 যুক্ত হয়ে 6-কার্বনবিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এসিড (2 কার্বোক্সি 3 কিটো অ্যারাবিনিটল 1.5 বিসফসফেট) উৎপন্ন হয়।

[C_3 চক্রের ফিকসিং এনজাইম হলো রুবিস্কো। এটি পৃথিবীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম, কারণ–এটি প্রাকৃতিক জগৎ এবং জীবজগতের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন সৃষ্টি করে। রুবিস্কো হলো 'রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ অক্সিজিনেজ (Ribulose Bisphosphate Carboxylase Oxygenase) এনজাইমের অ্যাক্রোনিম (acronym)।]

২. কিটো এসিড সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই H_2O র সহায়তায় ভেঙ্গে তিন কার্বনবিশিষ্ট 2 অণু 3 ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3PGA) উৎপন্ন হয়। 3 ফসফোগ্লিসারিক এসিড ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ।

$$\text{রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট} \xrightarrow[\text{rubisco}]{CO_2} \text{কিটো এসিড} \xrightarrow[\text{rubisco}]{H_2O} \text{3-ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3PGA)}$$

[6 চক্রে 12 অণু 3PGA তৈরি হয়]

খ. ফসফেট যোগ বা ফসফোরাইলেশন

৩. 3 ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় 3 ফসফোগ্লিসারিক এসিড ATP থেকে এক অণু অজৈব ফসফেট (*Pi*) গ্রহণ করে 1,3 বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড (BPGA)-এ পরিণত হয়। এখানে 1টি ATP খরচ হয় এবং 1টি ADP মুক্ত হয়।

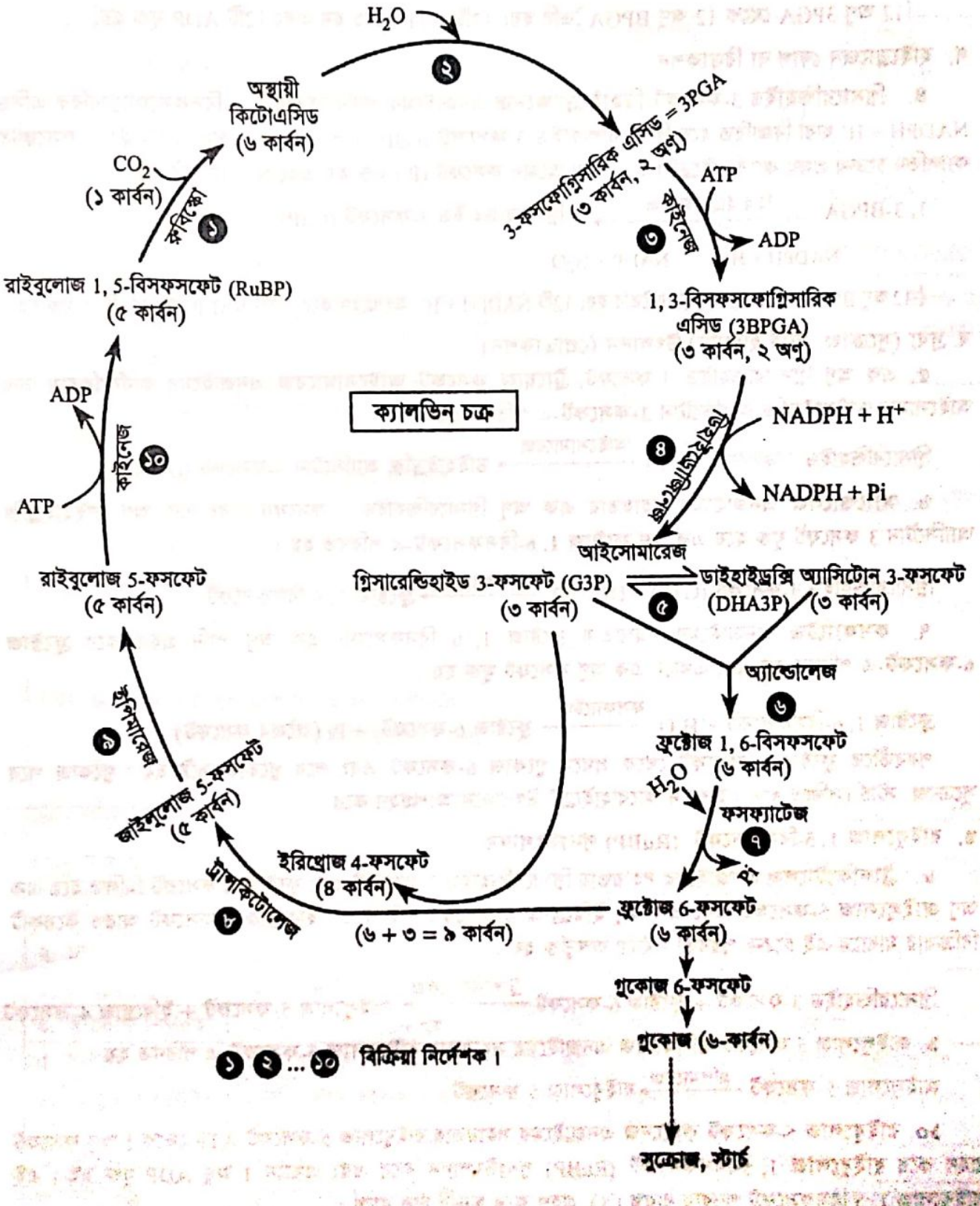

চিত্র ৯.৩.১৬ : ক্যালভিন চক্র (সরল চিত্র)

3 ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3PGA) + ATP $\xrightarrow{\text{ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ}}$ 1.3-বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড (BPGA) + ADP

[12 অণু 3PGA থেকে 12 অণু BPGA তৈরি হয়; 12টি ATP খরচ হয় এবং 12টি ADP মুক্ত হয়]

গ. হাইড্রোজেন যোগ বা রিডাকশন

৪. গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় 1, 3 বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড $NADPH + H^+$ দ্বারা বিজারিত হয়ে গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট (G3P)-এ পরিণত হয় (গ্লিসারেল্ডিহাইড 3 ফসফেটই ক্যালভিন চক্রের প্রথম কার্বোহাইড্রেট)। এ সময় অজৈব ফসফেট (Pi) মুক্ত হয় এবং NADP সৃষ্টি হয়।

1, 3-BPGA $\xrightarrow[NADPH + H^+ \quad NADP + H_2O]{\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}}$ গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট (G3P)

[12 অণু BPGA থেকে 12 অণু G3P তৈরি হয়; 12টি $NADPH + H^+$ অংশগ্রহণ করে, 12টি NADP এবং 12 টি Pi মুক্ত হয়]

ঘ. দ্রব্য (সুক্রোজ, স্টার্চ ইত্যাদি) উৎপাদন (প্রোডাকশন)

৫. এক অণু গ্লিসারেল্ডিহাইড 3 ফসফেট, ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় তার আইসোমার ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট-এ পরিণত হয়।

গ্লিসারেল্ডিহাইড 3 ফসফেট (G3P) $\xrightarrow{\text{আইসোমারেজ}}$ ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট (DHA3P)

৬. অ্যাল্ডোলেজ এনজাইমের সহায়তায় এক অণু গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট এবং এক অণু ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3 ফসফেট যুক্ত হয়ে এক অণু ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট-এ পরিণত হয়।

গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট (G3P) + DHA3P $\xrightarrow{\text{অ্যাল্ডোলেজ}}$ ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট

৭. ফসফ্যাটেজ এনজাইমের সহায়তায় ফ্রুক্টোজ 1, 6 বিসফসফেট এক অণু পানি গ্রহণ করে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট-এ পরিণত হয় এবং এখানে এক অণু ফসফেট মুক্ত হয়।

ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট + H_2O $\xrightarrow{\text{ফসফ্যাটেজ}}$ ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট + Pi (অজৈব ফসফেট)

পরবর্তীতে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট থেকে প্রথমে গ্লুকোজ 6-ফসফেট এবং পরে গ্লুকোজ সৃষ্টি হয়। গ্লুকোজ পরে সুক্রোজ, স্টার্চ (সঞ্চিত খাদ্য) ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

ঙ. রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট (RuBP) পুনঃউৎপাদন

৮. ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইমের সহায়তায় গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট এবং ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট মিলিত হয়ে এক অণু জাইলুলোজ 5-ফসফেট এবং এক অণু ইরিথ্রোজ 4-ফসফেট সৃষ্টি করে। ইরিথ্রোজ-4-ফসফেট আরও কয়েকটি বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই চক্রের পরবর্তী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট + ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট $\xrightarrow{\text{ট্রান্সকিটোলেজ}}$ জাইলুলোজ 5-ফসফেট + ইরিথ্রোজ 4-ফসফেট

৯. জাইলুলোজ 5-ফসফেট এপিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় রাইবুলোজ 5-ফসফেট-এ পরিণত হয়।

জাইলুলোজ 5-ফসফেট $\xrightarrow{\text{এপিমারেজ}}$ রাইবুলোজ 5-ফসফেট

১০. রাইবুলোজ 5-ফসফেট কাইনেজ এনজাইমের সহায়তায় রাইবুলোজ 5-ফসফেট ATP থেকে 1 অণু ফসফেট গ্রহণ করে রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট (RuBP) পুনঃউৎপাদন করে এবং এখানে 1 অণু ADP মুক্ত হয়। এই রাইবুলোজ 1, 5 বিসফসফেট পুনরায় বায়ুস্থ CO_2 গ্রহণ করে চক্রটি চালু রাখে।

রাইবুলোজ 5 ফসফেট +ATP $\xrightarrow{\text{কাইনেজ}}$ রাইবুলোজ 1.5 বিসফসফেট (পুনঃউৎপাদন)

C_3 (ক্যালভিন চক্র) উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের সারসংক্ষেপ

সালোকসংশ্লেষণের পর্যায়	স্থান	অন্তর্ভুক্তি	উৎপাদন
আলোকনির্ভর পর্যায়	(i) ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেন (ii) PS-I (P700) (iii) PS-II (P680)	(i) আলোর ফোটন (ii) H_2O	(i) NADPH + H^+ (ii) ATP (iii) O_2
আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়	ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা	(i) $6CO_2$ (ii) 18 ATP (iii) 12 NADPH + H^+	(i) গ্লুকোজ (১ অণু) (ii) পুনঃউৎপাদন 6RuBP

আলোকনির্ভর পর্যায়ে অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় সমান সংখ্যক ATP ও NADPH + H^+ উৎপন্ন হয় কিন্তু ক্যালভিন চক্রে ATP খরচ হয় ৬-অণু বেশি। উদ্ভিদ এই অতিরিক্ত ATP চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করে নেয়।

ক্যালভিন চক্রের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ক্যালভিন চক্রের মূল বিষয় হলো–

(i) 6RuBP এর সাথে $6CO_2$ সংযুক্তিকরণ এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ 3PGA (3-ফসফোগ্লিসারিক এসিড) তৈরি (১২ অণু)।

(ii) প্রথম কার্বোহাইড্রেট 3-কার্বনবিশিষ্ট, ১২ অণু G3P (গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট) তৈরি (১২ অণু)।

(iii) ৬ অণু RuBP পুনঃউৎপাদন ও চক্রের বাইরে ১ অণু গ্লুকোজ তৈরি। সালোকসংশ্লেষণ এর মূল উদ্দেশ্যই গ্লুকোজ তৈরি।

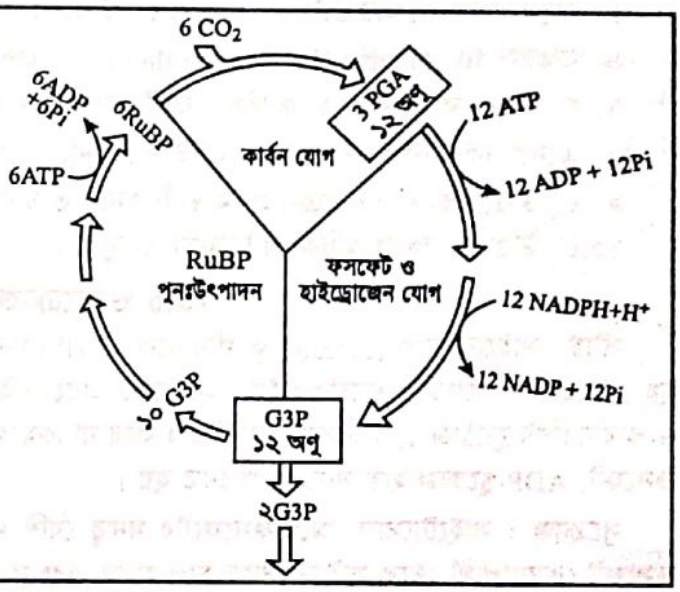

আলোক পর্যায় ও আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	আলোক পর্যায়	আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়
১. পর্যায়	এটি সালোকসংশ্লেষণের প্রথম পর্যায়ের প্রক্রিয়া।	সালোকসংশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।
২. স্থান	ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় সম্পন্ন হয়।	ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় সম্পন্ন হয়।
৩. অক্সিজেন উৎপাদন	অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।	অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না।
৪. আলোক নির্ভরতা	আলোকের প্রয়োজন হয়।	আলোকের প্রয়োজন হয় না।
৫. সংশ্লেষ	ATP এবং NADPH + H^+ সংশ্লেষিত হয়।	গ্লুকোজ ও অন্যান্য শর্করা সংশ্লেষিত হয়।
৬. বিক্রিয়ার প্রকৃতি	একটি ভৌত প্রক্রিয়া এবং অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়।	জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং অপেক্ষাকৃত ধীরে সম্পন্ন হয়।
৭. জারণ-বিজারণ	NADP বিজারিত হয়।	NADP বিজারিত হয় না।
৮. গ্রাহী বস্তু	ক্লোরোফিল আলোকগ্রাহী বস্তু।	RuBP বাতাসের CO_2 গ্রহণ করে।
৯. বিশোষণ	সূর্যালোক শোষিত হয়।	বাতাসের CO_2 শোষিত হয়।
১০. নির্ভরশীলতা	আলোক নিরপেক্ষ দশার উপর নির্ভরশীল নয়।	আলোক দশায় উৎপন্ন NADPH + H^+ এবং ATP এর উপর নির্ভরশীল।

100%

C_3 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

যে সব উদ্ভিদের ক্যালভিন চক্র ঘটে এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থরূপে ৩-কার্বনবিশিষ্ট ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3PGA) উৎপন্ন হয়, সে সব উদ্ভিদকে C_3 উদ্ভিদ বলে। আর এ চক্রকে বলে C_3 চক্র।

সে সকল শৈবাল, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস ও নগ্নবীজী উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার সবগুলোতেই C_3 চক্র পাওয়া গেছে। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদে, বিশেষ করে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে C_3 চক্র বিদ্যমান। বেশ কিছু একবীজপত্রী উদ্ভিদেও C_3 চক্র লক্ষ করা যায়। C_3 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. C_3 উদ্ভিদের স্টোম্যাটা দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং রাতে বন্ধ থাকে।
২. C_3 উদ্ভিদের পাতায় বান্ডলসীথ ঘিরে মেসোফিল টিস্যুর কোনো পৃথক স্তর থাকে না অর্থাৎ ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি অনুপস্থিত।
৩. ক্লোরোপ্লাস্টে একই ধরনের গ্রানাম থাকে।
৪. C_3 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের জন্য তাপমাত্রা 10-25°C প্রয়োজন।
৫. বায়ুমন্ডলে 20% এর বেশি O_2 থাকলে C_3 উদ্ভিদের কার্বন বিজারণ বাধাগ্রস্ত হয়।
৬. বাতাসে 50-150 ppm (Parts per million) CO_2 এর উপস্থিতিতে C_3 চক্র ভালো চলে।
৭. C_3 উদ্ভিদে রাইবুলোজ ১, ৫ বিসফসফেট প্রথম CO_2 গ্রহণ করে।
৮. এদের শর্করা উৎপাদন ক্ষমতা প্রজাতিভেদে নিম্ন থেকে উচ্চ।
৯. C_3 উদ্ভিদে ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ-৩ ফসফোগ্লিসারিক এসিড।
১০. C_3 উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিক্রিয়া একমুখী।

স্টার্চ ও সুক্রোজ উৎপাদন

স্টার্চ : সাইটোসোলে (cytosol) অর্থোফসফেটের (Pi) ঘনত্ব কম থাকলে ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে স্টার্চ সংশ্লেষিত হয়। ট্রায়োজ ফসফেট গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট মিলিতভাবে এক অণু ৬-কার্বনবিশিষ্ট ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট তৈরি করে যা ক্রমান্বয়ে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 1 ফসফেট, ADP-গ্লুকোজ হয়ে স্টার্চ-এ পরিণত হয়।

সুক্রোজ : সাইটোসোলে অর্থোফসফেটের ঘনত্ব বেশি থাকলে Pi এর বিনিময়ে Pi ট্রান্সপোর্টার দিয়ে ট্রায়োজ ফসফেট ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে সাইটোসোলে চলে আসে এবং ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট, ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 1-ফসফেট, UDP গ্লুকোজ (UDP = ইউরিডিন ডাই-ফসফেট) হয়ে শেষ পর্যন্ত সুক্রোজ হিসেবে জমা হয়। সুক্রোজ সারা উদ্ভিদদেহে পরিবাহিত হয়। স্টার্চ এবং সুক্রোজ এ চক্রে উৎপাদিত হয় কিন্তু কোন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

গ্লুকোজ, স্টার্চ, সুক্রোজ এসব দ্রব্য উৎপাদন ক্যালভিন চক্রের বাইরে হয়। এরা চক্রের অংশ নয়।

আলোকশ্বসন বা ফটোরেসপিরেশন (Photorespiration)

আলোর সাহায্যে O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করার প্রক্রিয়া হলো ফটোরেসপিরেশন। সবুজ উদ্ভিদে C_3 চক্র তথা ক্যালভিন চক্র চলাকালে পরিবেশে তীব্র আলো ও উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি হলে ফটোসিনথেসিস না হয়ে **ফটোরেসপিরেশন** ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্টে CO_2 এর পরিমাণ কম এবং O_2 এর পরিমাণ বেশি হলেই ফটোরেসপিরেশন হয়। তীব্র আলো ও অধিক তাপমাত্রায় (৩০° সে. এর উপরে) গাছে পানি সংরক্ষণের জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পাতার অভ্যন্তরে CO_2 গ্যাস সীমিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় RuBP, CO_2 এর পরিবর্তে O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে ২-কার্বনবিশিষ্ট গ্লাইকোলেট (glycolate) তৈরি করে। গ্লাইকোলেট ক্লোরোপ্লাস্ট ত্যাগ করে সাইটোপ্লাজম-এ এসে পারঅক্সিসোম (peroxisome) এ প্রবেশ করে। পারঅক্সিসোমে প্রবেশ করে গ্লাইকোলেট O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে কিছু দ্রব্য তৈরি করে যা মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং বিক্রিয়া শেষে CO_2 ত্যাগ করে। কাজেই ফটোরেসপিরেশন প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট, পারঅক্সিসোম এবং মাইটোকন্ড্রিয়া-এ তিনটি অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে। ফটোরেসপিরেশন C_3 উদ্ভিদের ফটোসিনথেসিস হার ২৫% পর্যন্ত কমাতে পারে।

CamScanner

আলোকশ্বসন প্রক্রিয়া প্রকৃতশ্বসন নয় কেন ? আলোকশ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন যৌগ ভেঙ্গে CO_2 নির্গত হয় ও O_2 গৃহীত হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় কোনো ATP উৎপন্ন হয় না বলে এ প্রক্রিয়াকে প্রকৃত শ্বসন বলা যায় না।

আলোকশ্বসন বা ফটোরেসপিরেশন ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য	
ফটোরেসপিরেশন	শ্বসন
১. প্রক্রিয়াটি আলোকনির্ভর।	১. এটি আলোকনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া।
২. ক্লোরোপ্লাস্ট, পারঅক্সিসোম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার সাথে জড়িত।	২. মাইটোকন্ড্রিয়ার সাথে জড়িত।
৩. কোনো ATP ও NADPH উৎপন্ন হয় না।	৩. ATP ও NADPH উৎপন্ন হয়।
৪. ক্যালভিন চক্রের ওপর নির্ভরশীল।	৪. ক্যালভিন চক্রের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
৫. প্রধানত C_3 উদ্ভিদে ঘটে।	৫. সকল জীবের সজীব কোষে ঘটে।

২. হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র : C_4 চক্র (Hatch and Slack Cycle : C_4 Cycle)

H.P.Kortschak ও তাঁর সহযোগীরা $^{14}CO_2$ প্রয়োগ করে ইক্ষু উদ্ভিদে এবং একই পদ্ধতি ব্যবহার করে **Y. Karpilov** ও তাঁর সহযোগীরা ভুট্টা (*Zea mays*) উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে ৪-কার্বনবিশিষ্ট ম্যালিক এসিড এবং অ্যাসপারটিক এসিডে ৭০-৮০ ভাগ চিহ্নিত কার্বন দেখতে পান, অর্থাৎ গবেষণায় ব্যবহৃত $^{14}CO_2$ কোনো C_3 পদার্থ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে না বরং C_4 পদার্থ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করেছে। **এটি ক্যালভিন চক্রের ব্যতিক্রম।** পরবর্তীতে **M.D. Hatch** ও **C.R.Slack** নামক দুজন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী **ইক্ষু উদ্ভিদ** নিয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণা করে কার্বন বিজারণের এ ভিন্ন পথকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন (অর্থাৎ ইক্ষু উদ্ভিদেই পূর্ণাঙ্গভাবে এই গতিপথ প্রথম আবিষ্কৃত হয়), যা পরে **Hatch & Slack** গতিপথ বা C_4 চক্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। (১৯৭০)। **ডাইকার্বোক্সিলিক চক্র** নামেও এটি পরিচিত। বর্তমানে ১৬টি গোত্রের বহু উদ্ভিদে এ গতিপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাতার মেসোফিল কোষ এবং ব্যান্ডলসীথ কোষ সম্মিলিতভাবে এই গতিপথ সম্পন্ন করে। ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ এবং পাইরুভেট-অর্থোফসফেট ডাইকাইনেজ এনজাইম মেসোফিল কোষে সীমাবদ্ধ থাকে। ডিকার্বোক্সিলেজসমূহ এবং ক্যালভিন চক্রের সকল এনজাইম বান্ডলসীথ কোষে সীমাবদ্ধ থাকে।

হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রটি নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় :

১. **কার্বোক্সিলেজ** এনজাইমের সহায়তায় মেসোফিল কোষের **ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড** (৩ কার্বন) বায়ুস্থ CO_2 (HCO_3^- হিসেবে অংশগ্রহণ করে) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে **অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড** (৪ কার্বন) তৈরি করে, যা এ চক্রের **প্রথম স্থায়ী যৌগ।**

২. **ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইমের সহায়তায় অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড **ম্যালিক এসিড** বা **অ্যাসপারটিক এসিড**-এ (৪ কার্বন) পরিণত হয়। এখানে $NADPH + H^+$ যুক্ত হয়ে NADP তৈরি করে।

৩. ম্যালিক এসিড বা অ্যাসপারটিক এসিড মেসোফিল কোষ থেকে প্লাজমোডেসমাটা দিয়ে বান্ডলসীথ কোষে প্রবেশ করে।

৪. বান্ডলসীথ কোষে ম্যালিক এসিড বা অ্যাসপারটিক এসিড NADP এর উপস্থিতিতে পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়। এ সময় CO_2 এবং $NADPH + H^+$ উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় **ডিকার্বোক্সিলেজ** এনজাইম সহায়তা করে। এই বিক্রিয়ায় সৃষ্ট CO_2 সরাসরি বান্ডলসীথ কোষের ক্যালভিন চক্রে (C_3 চক্রে) অংশগ্রহণ করে (অর্থাৎ রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট কর্তৃক গৃহীত হয়) এবং চক্রটি এখানে সুসম্পন্ন হয়।

৫. অন্যদিকে পাইরুভিক এসিড সরাসরি (অথবা উদ্ভিদভেদে এলানিন তৈরির মাধ্যমে) বান্ডলসীথ কোষ থেকে প্লাজমোডেসমাটা দিয়ে মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে।

৬. পাইরুভিক এসিড মেসোফিল কোষে পাইরুভিক এসিড কাইনেজ এনজাইমের সহযোগিতায় ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড-এ পরিণত হয়। এখানে একটি ATP থেকে একটি ADP তৈরি হয়। ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড পুনরায় CO_2 গ্রহণ করে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড তৈরি করে এবং চক্রটি সচল রাখে।

কাজেই দেখা যায়, C_4 উদ্ভিদে একই সাথে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং ক্যালভিন চক্র উভয়ই পরিচালিত হয়। বান্ডলসীথ কোষে CO_2 এর অভাব হয় না, তাই কোনো ফটোরেসপিরেশন হয় না, ফলে কার্বন বিজারণ হার অধিক হওয়ায় C_4 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হার বেশি এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি।

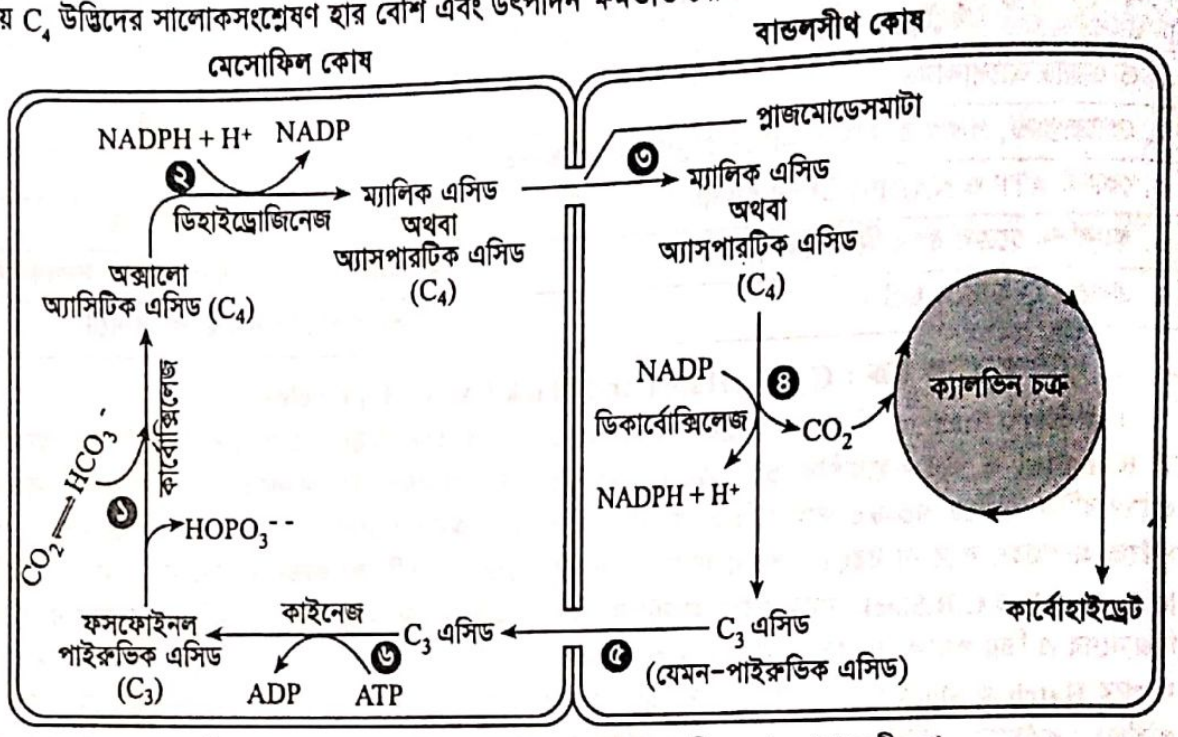

চিত্র ৯.৩.১৭ : হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র বা C_4 চক্রের সামগ্রিক রূপরেখা (সরলীকৃত)

উদ্ভিদে তিন প্রকার C_4 গতিপথ লক্ষ করা যায় : (i) বান্ডলসীথ কোষে স্থানান্তরিত C_4 এসিডের ধরণ, (ii) মেসোফিল কোষে স্থানান্তরিত C_3 এসিডের ধরণ এবং (iii) বান্ডলসীথ কোষে ডিকার্বোক্সিলেশন এনজাইমের প্রকার-এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তিন প্রকার C_4 গতিপথ নিম্নে দেখানো হলো:

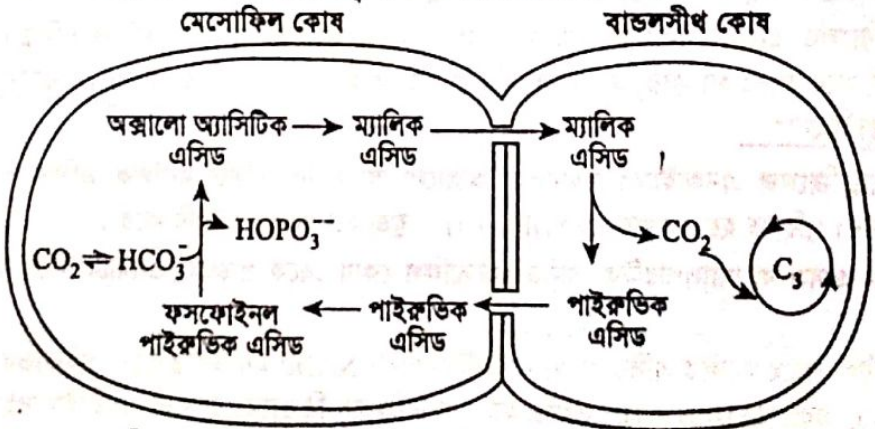

চিত্র ৯.৩.১৮ : C_4 গতিপথ : NADP-malic enzyme প্রকার। ইক্ষু, ভুট্টা, সরগাম উদ্ভিদে এ চক্র পরিচালিত হয়।

(A) NADP-malic enzyme প্রকার।

ভুট্টা, ইক্ষু, সরগাম, ক্র্যাব ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী (৯.৩.১৮ নং চিত্রে দেখানো হলো)।

(B) NADP-malic enzyme প্রকার। মিল্ল্যাত, কাউন, চিনা ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী।

(C) Phosphoenolpyruvate carboxykinase প্রকার। গিনি ঘাসে (Guinea grass) এ প্রকার কার্যকরী।

বি. দ্র. আমাদের দেশে উপরে উল্লেখিত উদ্ভিদগুলো ছাড়া বাকি অধিকাংশ উদ্ভিদই (ধান, পাট, আম, জাম, কলা প্রভৃতি) ইত্যাদি C_3 উদ্ভিদ। ধানকে C_4 করার জন্য একটি গবেষণা প্রকল্প চলমান আছে।

C_3 উদ্ভিদ ও C_4 উদ্ভিদ এর মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	C_3 উদ্ভিদ	C_4 উদ্ভিদ
১. তাপমাত্রা	উচ্চ তাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম নয়।	উচ্চ তাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম।
২. ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে মেসোফিল কোষের কোনো পৃথক স্তর থাকে না।	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে অরীয়ভাবে সজ্জিত মেসোফিল কোষের ঘন স্তর বিদ্যমান (ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি)।
৩. ক্লোরোপ্লাস্টের প্রকার	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট একই রকম।	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট দুই রকম : (i) গ্রানাযুক্ত মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এবং (ii) গ্রানাবিহীন বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্ট।
৪. CO_2 এর ঘনত্ব	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমন্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ৫০ ppm (parts per million) প্রয়োজন (৫০-১৫০ ppm)।	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমন্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ০.১০ ppm প্রয়োজন (০.১০-১০ ppm)।
৫. বিক্রিয়া	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং বান্ডলসীথ কোষে CO_2 সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।
৬. উৎপত্তি	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_3 উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করেছে।	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_4 উদ্ভিদ উষ্ণমন্ডলে উৎপত্তি লাভ করেছে।
৭. সালোকসংশ্লেষণ হার	এসব উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হার কম।	এসব উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হার বেশি।
৮. O_2 এর উপস্থিতি	স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে ১% বেশি অক্সিজেনের উপস্থিতি সালোকসংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।	অতিরিক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি সালোকসংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় না।
৯. কার্বন বিজারণ গতিপথ	শুধুমাত্র ক্যালভিন চক্রের মাধ্যমে CO_2 বিজারিত হয়।	ক্যালভিন চক্র এবং হ্যাচ ও স্ল্যাক উভয় চক্রই সম্পন্ন হয়।
১০. শর্করা উৎপাদন	C_3 চক্রের মাধ্যমেই শর্করা প্রস্তুত হয়।	C_4 চক্র খাদ্য প্রস্তুত করে না; বরং C_3 চক্রের সহায়তায় প্রস্তুত করে।
১১. উদাহরণ	C_4 উদ্ভিদ ব্যতীত সকল উদ্ভিদ। উল্লেখযোগ্য হলো- অধিকাংশ নগ্নবীজী উদ্ভিদ, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস, সালোকসংশ্লেষণকারী শৈবাল, অধিকাংশ আবৃতজীবী উদ্ভিদ, বিশেষ করে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (যেমন- পাট, আম, জাম, লিচু ইত্যাদি)। বেশ কিছু একবীজপত্রী উদ্ভিদেও C_3 চক্র দেখা যায়, যেমন- ধান, কলা।	বর্তমানে ১৬টি গোত্রের বহু উদ্ভিদে C_4 চক্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে Poaceae (Gramineae), Cyperaceae ইত্যাদি গোত্রের একবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন-ইক্ষু, গম, ভুট্টা, ওট, বার্লি, মুথা ঘাস, ক্র্যাব ঘাস, জোয়ার বা সরগাম, কাউন, মিল্লাত, চিনা, গিনি ঘাস ইত্যাদি এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন- *Euphorbia* sp., *Amaranthus* sp. ইত্যাদি।

ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি (Krans anatomy) : ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি হলো উচ্চ তাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য C_4 উদ্ভিদসমূহের পাতার বিশেষ অন্তর্গঠন। C_4 উদ্ভিদের পাতার বান্ডলসীথের চারদিকে ক্ষুদ্র ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত মেসোফিল টিস্যুর যে বিশেষ বলয় থাকে তাকে ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি বলে। এরা উদ্ভিদকে অল্প পরিমাণ CO_2 এর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে। এর মেসোফিল টিস্যুতে আলোক বিক্রিয়া এবং বান্ডলসীথ টিস্যুতে CO_2 সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।

ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ-স্ল্যাক চক্রের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	ক্যালভিন চক্র	হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র
১. যে কোষে ঘটে	কেবল মেসোফিল কোষে হয়।	মেসোফিল ও বান্ডলসীথ কোষে হয়।
২. ফটোরেসপিরেশন	ঘটে।	ঘটে না।
৩. প্রাথমিক CO_2 গ্রহীতা	RuBP (রাইবুলোজ ১-৫ বিসফসফেট)।	PEP (ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড)।
৪. CO_2 ফ্রিকসিং এনজাইম	রুবিস্কো।	PEP কার্বোক্সিলেজ।
৫. প্রথম স্থায়ী দ্রব্য	৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড [PGA] (৩-কার্বন)।	অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড [OAA] (৪-কার্বন)।
৬. CO_2 এর জন্য কার্বোক্সিলেজ এর দক্ষতা	মধ্যম।	উচ্চ।
৭. ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন	একই রকম।	ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন দু'রকম : বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট।
৮. আদর্শ তাপমাত্রা	১০° সে. থেকে ২৫° সে.।	৩০° সে. থেকে ৪৫° সে.।
৯. CO_2 এর ঘনত্ব	বায়ুমন্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ৫০ ppm CO_2 থাকা প্রয়োজন।	বায়ুমন্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ০.১০ ppm CO_2 থাকলেও চলে।

C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

যে সব উদ্ভিদে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হিসেবে ৪- কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড উৎপন্ন হয় (হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রে) সে সব উদ্ভিদকে C_4 উদ্ভিদ বলে। আর এ চক্রকে বলে C_4 চক্র।

১. C_4 উদ্ভিদ প্রচন্ড আলোতে অর্থাৎ 30-45°C তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলে বেশি জন্মায়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের একবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং বেশ কিছু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদেও C_4 চক্র দেখা যায়।

২. C_4 উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ ঘটে।

৩. এরা পানির অপচয় কম করে এবং শুষ্ক অঞ্চলেও অভিযোজিত হতে পারে।

৪. বান্ডলসীথ কোষ ও মেসোফিল কোষে অনেক প্লাজমোডেজমাটা থাকে।

৫. C_4 উদ্ভিদের পাতার বান্ডলসীথ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

৬. বান্ডলসীথের কোষগুলো ভাস্কুলার বান্ডলের সাথে অরীয়ভাবে অবস্থান করে।

৭. বান্ডলসীথের মাঝে যে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়, তাতে গ্রানা অনুপস্থিত কিন্তু মেসোফিল কোষে উন্নত প্রকৃতির গ্রানা বিদ্যমান। যেমন-ইক্ষু উদ্ভিদের পাতা।

৮. C_4 উদ্ভিদের মেসোফিল কোষে রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ এনজাইমের কার্যকারিত নেই।

৯. NADP ম্যালিক এসিড এনজাইমের উপস্থিতিতে বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে C_3 চক্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিপাকীয় শক্তি $NADPH + H^+$ উৎপাদিত হয়।

১০. বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে প্রচুর স্টার্চ দানা থাকে কিন্তু মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্টে স্টার্চ দানা থাকে না।

১১. রুবিস্কো এনজাইম মেসোফিলে থাকে না, ব্যান্ডলসীথে অবস্থান করে।

১২. C_4 উদ্ভিদে আলোকশ্বসন প্রায় অনুপস্থিত এবং সহজে শনাক্ত করা যায় না। তাই সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত শর্করার অপচয় কম হয়।

CamScanner

C_4 উদ্ভিদ চক্রের গুরুত্ব

১. C_4 উদ্ভিদ প্রচুর আলোতে এবং ৩০°সে.– ৪৫°সে. তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হতে পারে, তাই উচ্চ তাপমাত্রায় এরা কর্মক্ষম থাকে।

২. C_4 চক্র অনেক C_4 উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজনীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে, যার জন্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও শুষ্ক অঞ্চলে এরা বেঁচে থাকতে পারে।

৩. C_4 উদ্ভিদের O_2 গ্রাহক ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড (৩ কার্বন বিশিষ্ট), C_3 উদ্ভিদের CO_2 গ্রাহক রাইবুলোজ 1.5 বিসফসফেট অপেক্ষা অধিক কার্যকর থাকে।

৪. উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র আংশিক বন্ধ থাকলেও C_4 গতিপথ চালু থাকে।

৫. অল্প CO_2 এর উপস্থিতি (মাত্র 10 ppm CO_2) থাকলেই C_4 গতিপথ চলতে পারে, তাই CO_2 কম হলেও কার্বন বিজারণ বন্ধ হয় না।

৬. C_4 উদ্ভিদে সাধারণত প্রস্বেদন ও আলোকশ্বসন কম হয় বলে CO_2 এর বিজারণ বেশি হয়।

৭. Kranz অ্যানাটমির জন্য C_4 উদ্ভিদের পাতায় এর খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয় ও অতি সহজেই এটি পরিবাহিত হতে পারে।

C_4 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ক্ষমতা C_3 উদ্ভিদ হতে বেশি কেন ?

১. C_4 উদ্ভিদের পরম তাপমাত্রা (৩২-৪৫°C) এবং C_3 উদ্ভিদের পরম তাপমাত্রা (১০-২৫°C) বা C_3 অপেক্ষা বেশি।

২. C_4 উদ্ভিদের কার্বন সংবন্ধনকারী এনজাইম অত্যাধিক কার্যকরী হওয়ার কারণে এরা অল্প পরিমাণ CO_2 এর উপস্থিতিতে উচ্চহারে সালোকসংশ্লেষণ ঘটাতে সক্ষম।

৩. বাতাসে ২০% এর অধিক অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও C_4 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

৪. C_4 উদ্ভিদের আলোকশ্বসন অনুপস্থিত বা কম হওয়ায় কার্বন অণুগুলো বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৫. ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত কোষ দ্বারা C_4 উদ্ভিদের বান্ডলসীথের চতুর্দিকে বেষ্টিত থাকায় শর্করা জাতীয় পদার্থ অতি সহজে পরিবাহিত হতে পারে।

৩. Crassulacean Acid Metabolism বা CAM প্রক্রিয়া

প্রথমে Crassulaceae গোত্রের কিছু উদ্ভিদে C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় CO_2 বিজারণ ও আত্তীকরণ ঘটে বলে জানা যায়। এ সমস্ত উদ্ভিদে CO_2 আত্তীকরণের প্রথম দিকে জৈব এসিড (বিশেষ করে ৪ কার্বন এসিড) সংশ্লেষিত হয়। এ বিপাক প্রক্রিয়াকে **Crassulacean Acid Metabolism** বা সংক্ষেপে **CAM** বলে। অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী **J.O. Osmond CAM** এর উপর অনেক কাজ করেন। Crassulaceae গোত্রের কিছু (উদ্ভিদ যেমন– *Sedum*) এবং কতগুলো অর্কিড, ক্যাকটাস, আনারস ইত্যাদি উদ্ভিদে রাতের বেলায় ক্র্যাসুলেসিয়ান এসিড বিপাক (CAM) ঘটে। এ চক্রের প্রথম স্থায়ী যৌগও 4 কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড। এসব উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র রাতে খোলা থাকে এবং দিনের বেলায় বন্ধ থাকে। এসব উদ্ভিদ উষ্ণ আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে। এসব উদ্ভিদে রাতে পত্ররন্ধ্রগুলো খোলা থাকার কারণ দিনের বেলায় এদের পাতায় জৈব এসিডের পরিমাণ কমে যায় যার ফলে p^H এর মাত্রাও কমে যায় এবং রাতে জৈব এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় যার ফলে p^H এর মাত্রা বেড়ে যায়।' এ প্রক্রিয়ার বিক্রিয়ার ধাপগুলো C_4 বিক্রিয়ার মতোই।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত O_2 এর উৎস

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

বিক্রিয়া থেকে দেখা যায় সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল CO_2 ও H_2O উভয়ের মধ্যেই অক্সিজেন বিদ্যমান। কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার শেষে নির্গত অক্সিজেনের উৎস CO_2 না পানি ? নিম্নবর্ণিত পরীক্ষাত্রয়ের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস সম্পর্কে জানা গেছে। পরীক্ষাগুলো নিম্নরূপ :

১. ভ্যান নীল (Van Niel) এর পরীক্ষা : ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান নীল সালফার ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, সালফার ব্যাকটেরিয়া পানির পরিবর্তে H_2S গ্যাস ও CO_2 ব্যবহার করে শর্করা ও পানি উৎপন্ন করে। কিন্তু সেখানে কোন অক্সিজেন নির্গত হয় না। তবে সালফার অণু নির্গত হয়। কাজেই এখানে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি।

$$2H_2S + CO_2 \xrightarrow{\text{আলো}} 2S + (CH_2O) + H_2O$$

২. হিল-বিক্রিয়া : ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ প্রাণ-রসায়নবিদ রবিন হিল CO_2 এর অনুপস্থিতিতে পানি, কিছু হাইড্রোজেন গ্রাহক ও পৃথকীকৃত ক্লোরোপ্লাস্ট একত্রে আলোতে রাখেন। পরীক্ষা শেষে দেখা যায় যে, CO_2 এর অনুপস্থিতির কারণে শর্করা তৈরি হয়নি কিন্তু পানি থেকে হাইড্রোজেন গ্রাহক কর্তৃক হাইড্রোজেন গৃহীত হয়েছে এবং অক্সিজেন নির্গত হয়েছে। হিলের এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি।

$$Z\ (\text{হাইড্রোজেন গ্রাহক}) + H_2O + \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} ZH_2 + \frac{1}{2}O_2$$

৩. রুবেন ও কেমেন এর তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা : ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যামুয়েল রুবেন ও তাঁর সহকর্মী কেমেন অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ O_2^{18} দ্বারা পানির অক্সিজেনকে চিহ্নিত করেন এবং উক্ত পানিতে কতকগুলো শৈবাল রেখে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলাফল লক্ষ করেন।

$$6CO_2 + 12H_2O^{18} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2^{18}$$

দেখা গেল যে, নির্গত অক্সিজেন তেজস্ক্রিয়। কাজেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, অক্সিজেনের উৎস পানি। একই পদ্ধতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে O_2^{18} দ্বারা চিহ্নিত করে এবং স্বাভাবিক পানি ব্যবহার করে একই পরীক্ষা করা হলো।

$$6CO_2^{18} + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6^{18} + 6H_2O^{18} + 6O_2$$

এবার দেখা গেল যে, শর্করা ও পানিতে তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন বিদ্যমান। কিন্তু সালোকসংশ্লেষণের ফলে নির্গত অক্সিজেন তেজস্ক্রিয় নয়।

কাজেই উপরোক্ত পরীক্ষা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি।

সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবকসমূহ (Factors of Photosynthesis)

অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মত সালোকসংশ্লেষণও কয়েকটি প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রভাবকগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ক. বাহ্যিক প্রভাবক ও খ. অভ্যন্তরীণ প্রভাবক।

ক. বাহ্যিক প্রভাবক

উদ্ভিদের দেহের বাইরের পরিবেশগত যেসব প্রভাবক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. আলো: আলো সালোকসংশ্লেষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। ক্লোরোফিল গঠনের জন্য আলো অপরিহার্য। আলোর প্রভাবে ক্লোরোফিল উত্তেজিত হয়ে পানির সালোকবিভাজন ঘটিয়ে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে। আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণের জন্য খোলা থাকে। সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন শর্করায় যে শক্তি সঞ্চিত হয় তাও আলো থেকে আসে।

আলোর তীব্রতার বৃদ্ধিতে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অতিরিক্ত তীব্র আলোতে সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়।

আলোকরশ্মির সাত রঙীয় বর্ণালীর কেবল লাল, কমলা, নীল ও বেগুনি অংশ থেকে ফোটন নামক আলোককণা সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। সালোকসংশ্লেষণের হার সরাসরি আলোর স্থায়িত্ব কালের উপর নির্ভরশীল।

২. কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) : কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। কারণ এ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণের ফলেই হয়ে থাকে। উদ্ভিদ বায়ুমন্ডল হতে CO_2 গ্রহণ

করে থাকে। বায়ুমন্ডলে CO_2 এর পরিমাণ শতকরা ০.০৪ ভাগ, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত CO_2 ব্যবহার করতে পারে, তাই বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়।

৩. পানি : কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো পানিও এ প্রক্রিয়ার একটি কাঁচামাল। পানির পরিমাণ হ্রাস পেলে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারও কমে যায়। তাই সালোকসংশ্লেষণ কমে যেতে পারে। অপরপক্ষে পানির উপস্থিতিই রক্ষীকোষকে স্ফীত করে এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। ফলে CO_2 অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কাজেই পানির পরিমাণ কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে আসে। পানি ভেঙ্গে O_2 নির্গত হয় এবং $NADPH + H^+$ তৈরি হয়।

৪. তাপমাত্রা : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (০° সে এর কাছাকাছি) এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (৪৫°সে.-এর উপরে) এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। কতিপয় ব্যাক্টেরিয়া ও উষ্ণ প্রস্রবণের নীলাভ-সবুজ শৈবালে ৭০°সে. তাপমাত্রায়ও এ প্রক্রিয়া চলতে পারে। তবে ৪৫°সে. এর উপরে তাপমাত্রা উঠলে অধিকাংশ উদ্ভিদেই এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ২০°সে. তাপমাত্রার নিচে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমে যায়। উদ্ভিদের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে অপ্টিমাম তাপমাত্রা ২২°সে. হতে ৩৫°সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৫. খনিজ পদার্থ : ক্লোরোফিল তৈরির জন্য লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। মাটিতে এসব খনিজ পদার্থের অভাব হলে ক্লোরোফিল তৈরি কমে যায়, ফলে সালোকসংশ্লেষণ হারও কমে যায়।

৬. অক্সিজেন : বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ হ্রাস পায়।

৭. ভিটামিন : কিছু শৈবাল বা অন্যান্য উদ্ভিদে বাইরে থেকে ভিটামিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেলে সালোকসংশ্লেষণ হয় কিন্তু না পেলে সালোকসংশ্লেষণ হয় না (এদের photoauxotrophs বলে)।

৮. রাসায়নিক পদার্থ : বাতাসে হাইড্রোজেন সালফাইড, ক্লোরোফরম, মিথেন বা অন্য কোনো বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে বা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

১. ক্লোরোফিল : ক্লোরোফিলের পরিমাণ ও এর সক্রিয়তার উপর সালোকসংশ্লেষণের হার নির্ভরশীল। ক্লোরোফিল আলোকশক্তি শোষণ করে কার্বন বিজারণে সাহায্য করে। তাই ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষণের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

২. পাতার বয়স : কম এবং বেশি বয়স্ক পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে তাই সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। সুতরাং পাতার বয়স সালোকসংশ্লেষণের হারকে প্রভাবিত করে।

৩. পাতার অন্তর্গঠন : পাতার অভ্যন্তরে পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, আন্তঃকোষীয় ফাঁক এবং মেসোফিল টিস্যুতে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

৪. শর্করার পরিমাণ : পাতায় শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

৫. এনজাইম : সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রকার এনজাইমের উপস্থিতি ও পরিমাণের উপর সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার নির্ভর করে।

৬. প্রোটোপ্লাজম : প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন উপাদান যেমন- পানি, রাসায়নিক পদার্থ এবং এনজাইমের উপস্থিতি সালোকসংশ্লেষণকে প্রভাবিত করে।

৭. পটাশিয়াম : এটি সম্ভবত সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, এ জন্য পটাশিয়ামের অভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর বা লিমিটিং ফ্যাক্টর (Limiting Factor)

সালোকসংশ্লেষণের হার কম বা বৃদ্ধির জন্য আলোক, তাপ, CO_2, H_2O, O_2 প্রভৃতি এক একটি ফ্যাক্টর। এ ফ্যাক্টরগুলি এককভাবে তেমন কাজ না করলেও সমষ্টিগতভাবে সালোকসংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক ফ্যাক্টরের ভূমিকা সর্বনিম্ন (minimum), উপযুক্ত (optimum) এবং সর্বোচ্চ (maximum) হতে পারে।

বিজ্ঞানী লিবিগ (Liebig) ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ল অব মিনিমাম (Law of Minimum) সূত্রটি প্রণয়ন করেন। এ সূত্রটি হলো- যদি একাধিক ফ্যাক্টর দ্বারা একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সর্বনিম্ন গতিসম্পন্ন ফ্যাক্টর দ্বারাই শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে লিমিটিং ফ্যাক্টর বলে।

ল অব লিমিটিং বা সীমাবদ্ধতা সূত্র মূলত ল অব মিনিমাম সূত্রের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৫ সালে এফ ব্লাকম্যান মন্তব্য করেন সালোকসংশ্লেষণে একাধিক ফ্যাক্টর অংশগ্রহণ করলেও নিম্নতমগতির ফ্যাক্টর হবে লিমিটিং ফ্যাক্টর।

CO_2 এর ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাই এ তিনটি ফ্যাক্টর উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হলো।

CO_2 এর ঘনত্বের ক্ষেত্রে

একটি আলোকিত সবুজ পাতা ঘণ্টায় ১০ mg CO_2 গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু ঘণ্টায় ১ mg প্রয়োগ করলে CO_2 লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। আবার CO_2 ঘণ্টায় ১, ২, ৩, ৪, ৫ mg হিসাবে বৃদ্ধি করলে সালোকসংশ্লেষণের হারও বৃদ্ধি পাবে। CO_2 এর ঘনত্ব ঘণ্টায় ১০mg এর উপরে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। কাজেই CO_2 এর ঘনত্ব লিমিটিং ফ্যাক্টর তা প্রমাণিত।

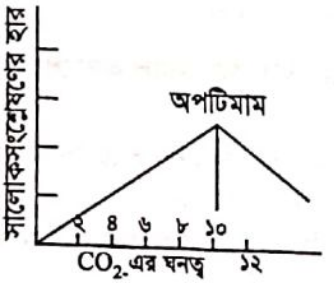

(ক) CO_2 এর ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত হলে সালোকসংশ্লেষণ কমে।

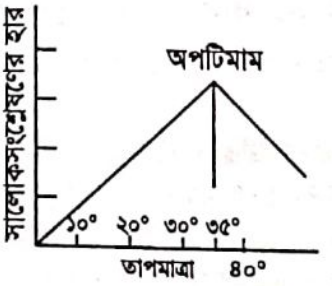

(খ) তাপমাত্রা ৩৫°C এ অপটিমাম এবং বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ হ্রাস পেতে থাকে।

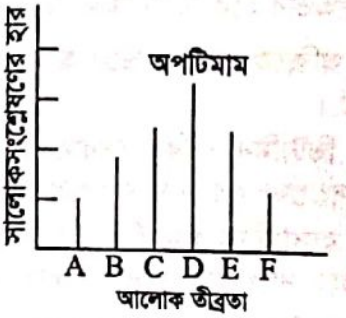

(গ) A-D এপর্যন্ত আলোক তীব্রতায় সালোকসংশ্লেষণের হার বাড়ছে এবং E-F এ সালোকসংশ্লেষণের হার কমছে।

তাপমাত্রার ক্ষেত্রে

সালোকসংশ্লেষণের অপটিমাম তাপমাত্রা হলে ৩০°–৩৫°C। কারণ এ তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার সর্বাধিক। 0°C তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার খুবই কমে যায় এবং ক্রমে ক্রমে ১°, ২°, ৩° – ৩৫°C উন্নীত করলে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়। আবার ৩৫°C এর উপরে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার দ্রুত কমতে থাকে। কাজেই তাপমাত্রা সালোকসংশ্লেষণের একটি লিমিটিং ফ্যাক্টর প্রমাণিত।

আলোর তীব্রতা

আলোর তীব্রতার সাথে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সমানুপাতিক। আলোর তীব্রতা দ্বিগুণ বাড়লে উদ্ভিদের বৃদ্ধিও দ্বিগুণ হয়। এভাবে তিন, চার, পাঁচ গুণ আলোর তীব্রতা বাড়ানো হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিও বাড়তে থাকে, আবার আলোর তীব্রতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই আলোর তীব্রতা সালোকসংশ্লেষণের একটি চমৎকার লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে প্রমাণিত।

সালোকসংশ্লেষণ হার (Photosynthctic Quoticnt বা PQ)

সালোকসংশ্লেষণ একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট সময়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপাদনের সময় নির্গত এবং গৃহীত CO_2 এর পরিমাণের অনুপাতকে সালোকসংশ্লেষণ হার বা PQ বলে। PQ এর মান সব সময় 1 হয়। তবে কোন কারণে CO_2 এর পরিমাণ কমে গেলে বা বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হারও কম বা বেশি হতে পারে।

নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ হার নির্ণয় করা হয়।

$$\text{সালোকসংশ্লেষণ হার (PQ)} = \frac{\text{নির্গত } O_2 \text{ এর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } CO_2 \text{ এর পরিমাণ}}$$

সালোকসংশ্লেষণের সাধারণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ -

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

$$\text{এক্ষেত্রে PQ} = \frac{\text{নির্গত } O_2 \text{ এর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } CO_2 \text{ এর পরিমাণ}} = \frac{6\,O_2}{6CO_2} = \frac{1}{1} = 1$$

আলো, তাপমাত্রা, কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ।

আলো, তাপ, CO_2 এবং ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কীভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. আলো : আলোর তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আলোর প্রকৃতি, তীব্রতা ও আলোকপ্রাপ্তির সময়কাল। আলোর প্রকৃতির মধ্যে কার্যকর বর্ণালি (action spectra) ও শোষণ বর্ণালি (absorption spectra) থেকে দেখা যায় যে, সালোকসংশ্লেষণে **লাল ও নীল আলো সর্বাধিক সক্রিয়**। কিন্তু শুধু এ দুটি আলো প্রয়োগ করে সালোকসংশ্লেষণের হারকে তেমন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। আলোর তীব্রতা পরিবর্তন করে এ হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আলো ১০০ ফুট ক্যান্ডল হতে শুরু করে ৩০০০ ফুট ক্যান্ডল পর্যন্ত বাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সালোকসংশ্লেষণকে উন্নীত করা যায়। তীব্র সূর্যালোকে ১০,০০০-১২,০০০ ফুট পর্যন্ত ক্যান্ডল পাওয়া যায়। কৃত্রিম পরিবেশে বা কাচের ঘরে নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো নিয়ন্ত্রণ সালোকসংশ্লেষণ ঘটানো সম্ভব। আলোর সময়কাল, স্থান ও ঋতুভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জানা গেছে, দীর্ঘ অবিরাম আলোর তুলনায় সবিরাম আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়। কারণ, দিনের বেলায় অবিরাম আলোতে সংশ্লেষিত সমস্ত উপাদান আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ে একই হারে ব্যবহার করতে পারে না। দীর্ঘদিনের আলো ১৪-১৬ ঘন্টা পর্যন্ত সময় পেলেও তা সালোকসংশ্লেষণের কোনো কাজে লাগে না। অবিরাম আলো হলে ১০-১২ ঘন্টায় সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব। ফলে দীর্ঘ বা ছোট দিনে আলোকপ্রাপ্তি ও আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আলোর গুণের উপরও সালোকসংশ্লেষণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। **Hoover** (1937) এবং **Gabrielsen** (1948) প্রমাণ করেন যে আলোর দৃশ্যমান বর্ণালির মধ্যে লাল অংশে (655 nm) অধিক সালোকসংশ্লেষণ ঘটে এবং আলোর সবুজ অংশে সালোকসংশ্লেষণের হার সর্বাপেক্ষা কম।

Hitchell, Gessner এবং Bohning বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, আলোর স্থিতিকাল বৃদ্ধি করলে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়।

২. তাপমাত্রা : তাপমাত্রা সালোকসংশ্লেষণের একটি প্রভাবক এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করে সংশ্লেষণ হার কম-বেশি করা যায়। তাপমাত্রা কম-বেশি করে আলোক পর্যায়ের বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ের ক্যালভিন চক্রকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণ অবস্থায় ১০° - ৩০° সে. তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় (৩০° সে. থেকে ৩৫° সে. পর্যন্ত তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে)। সুতরাং কৃত্রিম পরিবেশে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণের হারকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩. কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) : বায়ুতে CO_2 এর পরিমাণ ০.০৩-.০৪% পর্যন্ত ওঠা-নামা করে। CO_2 এর পরিমাণ বাড়িয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করা যায়। পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ০.৯-১% পর্যন্ত CO_2 সালোকসংশ্লেষণের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। এ ক্ষমতা বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যেমন-১.১% পর্যন্ত CO_2 এর পরিমাণ বায়ুতে বাড়িয়ে জলজ উদ্ভিদের সর্বোচ্চ সংশ্লেষণ হার পাওয়া যায়, কিন্তু গম গাছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংশ্লেষণ পাওয়া গেছে ০.১৫% CO_2 ঘনত্বে। সুতরাং বলা যায় যে, পরিবেশে CO_2 এর ঘনত্বের পরিমাণ কম-বেশি করে এর হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪. ক্লোরোফিল : ক্লোরোফিল সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্টে বিদ্যমান। পাতায় বিদ্যমান ক্লোরোফিলের পরিমাণ সালোকসংশ্লেষণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কোথায় যায় ?

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। একে একটি প্রাকৃতিক জৈব রাসায়নিক শিল্প বলা যেতে পারে। নিচে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো:

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ শ্বেতসার (starch) জাতীয় কঠিন পদার্থ তৈরি করে যা উদ্ভিদ সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। পাতায় শ্বেতসার প্রথমে গ্লুকোজ ও পরবর্তীতে সুক্রোজে পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চালিত হয়। সালোকসংশ্লেষণে প্রক্রিয়ায় সাইটোসোলে সুক্রোজ উৎপন্ন হয়। সুক্রোজ সরাসরি উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় এবং প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। কিছু অংশ বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন সঞ্চয়ী অঞ্চল, যেমন-ফুল, বীজ, মূল, কান্ড, পাতায় ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে। পরবর্তী সময় বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের জন্য শ্বসন প্রক্রিয়ায় তা ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে, কিছু অংশ অন্য প্রকার খাদ্য যেমন-চর্বি, আমিষ প্রভৃতি তৈরিতে ব্যয় হয়।

সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব (Importance of Photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। একে একটি প্রাকৃতিক জৈব রাসায়নিক শিল্প বলা যেতে পারে। নিচে সালোসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো:

১. সংশ্লেষণ (Synthesis) : সালোকসংশ্লেষণ হলো অজৈব কাঁচামাল থেকে জৈববস্তু সংশ্লেষণের একটি পদ্ধতি। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। আবার এই খাদ্য থেকে প্রোটিন ও ফ্যাট উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এই তিন প্রকার খাদ্যের উৎসই হলো সালোকসংশ্লেষণ।

২. বিকিরিত শক্তির রূপান্তর (Conversion of Radiant Energy) : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিকিরিত শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেক জীবই রাসায়নিক শক্তিকে তাদের কার্যাবলির জন্য ব্যবহার করে।

৩. উৎপাদক (Producers) : কেবলমাত্র সবুজ উদ্ভিদ এবং কতিপয় নিম্নশ্রেণির জীবের অজৈব বস্তু থেকে জৈববস্তু সংশ্লেষণের ক্ষমতা রয়েছে। এদেরকে **উৎপাদক** বলে। অন্যান্য জীবকে বলে **খাদক**; কারণ এরা উৎপাদক কর্তৃক সংশ্লেষিত খাদ্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

৪. নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (Daily used commodities) : অসংখ্য ব্যবহারযোগ্য বস্তু উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত বস্ত্র, জ্বালানি কাঠ, কাগজ, নাইলন, রাবার, রেয়ন, গঁদ, রজন, কর্ক ইত্যাদির মূলেও রয়েছে সালোকসংশ্লেষণ।

৫. যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical energy) : ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে পেশিশক্তি নির্ভর মানবসভ্যতা ক্রমশ যান্ত্রিকশক্তি নির্ভর হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, শিল্প প্রণালিতে কয়লা, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই জীবাশ্ম জ্বালানির মূলেও রয়েছে অতীতের উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ।

৬. চিকিৎসাবিজ্ঞান বনাম সালোকসংশ্লেষণ (Medical Science versus Photosynthesis) : চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত মরফিন, কুইনাইন, রেসারপিন, বেলেডোনা ইত্যাদির উৎস উদ্ভিদ। পরোক্ষভাবে এরাও সালোকসংশ্লেষণজাত। মানুষের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের বিশাল অংশই উদ্ভিদজগত থেকে পাওয়া যায়।

৭. কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) : সালোকসংশ্লেষণের ফলে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট থাকে। প্রতিনিয়ত দহন এবং শ্বসনের ফলে CO_2 সর্বদা পরিবেশে সংযোজিত হয়। সবুজ উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত পরিবেশ থেকে CO_2 শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জন্য। তাই পরিবেশে যাতে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে না যায় তার জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করা উচিত।

৮. অক্সিজেন (Oxygen) : বায়ুমন্ডলে বর্তমান অক্সিজেনের প্রায় সবটাই উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফসল। বায়ুজীবী জীবের সবাত শ্বসনের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। এই অক্সিজেন উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকেই আসে। দহন ও শ্বসন প্রক্রিয়ায় O_2 এর ব্যবহারের ফলে পরিবেশে O_2 এর ঘাটতি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পূরণ হয়।

৯. উৎপাদনশীলতা (Productivity) : সালোকসংশ্লেষণীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত CO_2 উৎপাদনের কু-প্রভাব হ্রাস পাবে। আবার শস্য উৎপাদন বাড়লে বাড়ন্ত মানব জনসংখ্যা ও গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদারও পূরণ হবে। ফলে বর্তমান সময়ে কীভাবে সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় সেদিকে অধিকতর গবেষণামূলক মনোনিবেশ করা দরকার।

CamScanner

ব্যবহারিক

সালোকসংশ্লেষণে CO_2 এর অপরিহার্যতা প্রমাণের পরীক্ষা
(Experiment to proof the necessity of CO_2 in Photosynthesis)

তত্ত্ব (Theory) : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিল ও সৌরশক্তির সহায়তায় পানি (H_2O) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য-গ্লুকোজ উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন (O_2) ত্যাগ করে সেই প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 ও H_2O হলো প্রধান উপাদান এবং সূর্যালোক ও ক্লোরোফিল সহায়ক উপাদান।

উপকরণ : টবসহ একটি সতেজ গাছ (লম্বা পাতাযুক্ত), বড় মুখ ওয়ালা কাঁচের বোতল, কাটা ছিপি, পানিসহ পেট্রিডিস, ২০% কস্টিক পটাশ দ্রবণ, ভেসেলিন বা মোম, ৮০% অ্যালকোহল ও ১% আয়োডিন দ্রবণ।

পরীক্ষা পদ্ধতি

১. পরীক্ষার পূর্বে টবসহ গাছটিকে তিনদিন ধরে অন্ধকার ঘরে রেখে শ্বেতসারবিহীন করতে হবে।

২. টেবিলের উপর বড় মুখ বিশিষ্ট বোতল কাত করে ওর ভিতরে কিছু কস্টিক পটাশ দ্রবণ দিতে হবে।

৩. এখন অন্ধকারে রাখা গাছটি থেকে একটি পাতা বোটাসহ ছিড়ে নিয়ে এর ফলকের অগ্রভাগ কাটাছিপির ভিতর দিয়ে বোতলের ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে।

৪. পাতার বৃন্তটি পানিপূর্ণ পেট্রিডিসে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

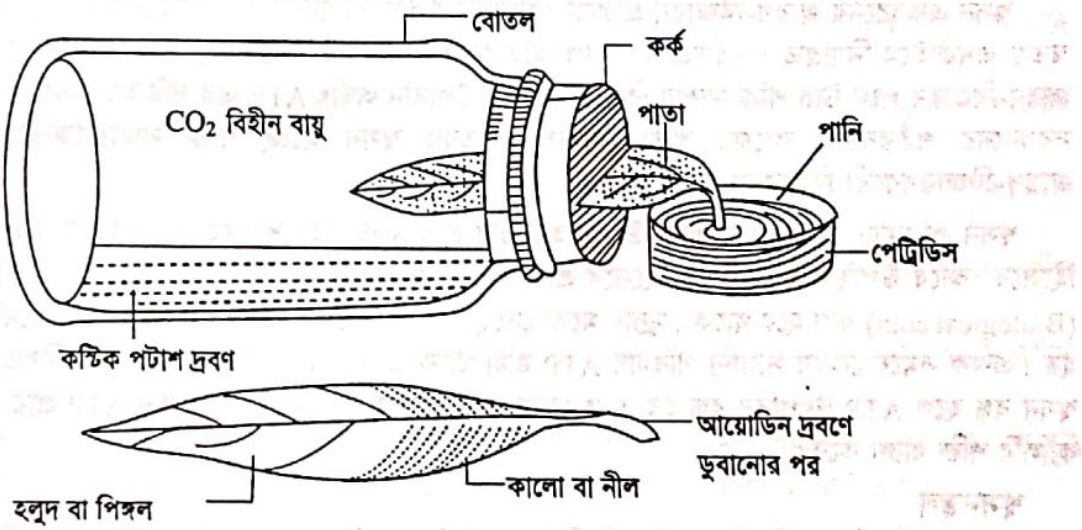

চিত্র ৯.৩.২০ : সালোকসংশ্লেষণে CO_2-এর অপরিহার্যতার পরীক্ষা

৫. বায়ুরোধক করার জন্য ছিপির কাটা অংশে ভেসিলিন বা মোমের প্রলেপ দিয়ে সমস্ত ফাঁকা অংশ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে।

৬. এ অবস্থায় পাতাসহ বোতলটি সূর্যালোকে রাখতে হবে।

৭. ৩–৪ ঘণ্টা পর পাতাটিকে বোতল থেকে বের করে ৮০% অ্যালকোহলে সিদ্ধ করতে হবে। এতে পাতাটি ক্লোরোফিল মুক্ত হয়ে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

৮. এরপর পাতাটিকে পানিতে ভালোভাবে ডুবিয়ে ১% আয়োডিন দ্রবণে ১ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : কয়েক মিনিট পর পাতাটি আয়োডিন দ্রবণ থেকে তুলে এনে পাতিত পানিতে ধুয়ে একটি পরিষ্কার সাদা কাগজের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। দেখা যাবে পাতার যে অংশটি বোতলের বাইরে ছিল তা আয়োডিন দ্রবণের সংস্পর্শে নীল বা কালো বর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু বোতলের ভিতরে থাকা পাতার অংশটিতে বর্ণের কোনো পরিবর্তন হয়নি (বা হালকা আয়োডিনের হলুদ বা পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে)।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত : বোতলের ভিতরে পাতার অংশ সূর্যালোক, পানি ও O_2 পেয়েছে, কেবল CO_2 পায়নি। কাজেই পাতার বোতলের ভিতরকার অংশে শ্বেতসার তৈরি না হওয়ার কারণ CO_2-এর অনুপস্থিতি, অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণের জন্য CO_2 অপরিহার্য।

৯.৪ : শ্বসন (Respiration)

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্যের আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে স্থিতিশক্তিরূপে খাদ্যে সঞ্চিত রাখে। বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে কতিপয় এনজাইমের ক্রিয়ায় এই খাদ্য জারিত (oxidised) হয়ে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিরূপে নির্গত হয়। এই শক্তি উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য জারণের মাধ্যমে শক্তি নির্গত হওয়ায় এই প্রক্রিয়া শ্বসন (respiration; ল্যাটিন, *respirare* = to breathe, শ্বাস নেয়া) নামে অভিহিত।

শ্বসনের সংজ্ঞা

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় O_2 এর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে কোষের জৈব খাদ্য জারণের মাধ্যমে শক্তি নির্গত করে এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে তাকে শ্বসন বলে। শ্বসনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে শ্বসনিক সমীকরণ বলা হয়। শ্বসনের সমীকরণটি নিম্নরূপ-

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O + 36ADP + 36\ Pi \xrightarrow{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2 + 12H_2O + 36\ ATP$$

গ্লুকোজ অক্সিজেন পানি (পূর্বে 38 ATP হিসেবে করা হতো)

শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্য জারিত হওয়ার ফলে খাদ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক স্থিতিশক্তি গতিশক্তি বা তাপশক্তিরূপে বের হয়ে আসে। এ তাপশক্তিই জীবের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব শক্তির চাহিদা মেটায়।

শ্বসন একধরনের জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া। শ্বসনিক উপাদান নির্দিষ্ট পথে পর্যায়ক্রমে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি ধাপ স্বতন্ত্র এনজাইমে নিয়ন্ত্রিত। পর্যায়ক্রমিক ধাপ অতিক্রমকালে প্রাথমিকভাবে কিছু শক্তি ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পরবর্তীতে জারণ-বিজারণ পথে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কিছু রাসায়নিক উপাদান অর্থাৎ ATP-এর সৃষ্টি হয়। এই ATP-ই তখন জীবের সবধরনের শরীরবৃত্তীয় কাজের শক্তি যোগায়। সুতরাং **শ্বসন হচ্ছে শক্তি সঞ্চারণকারী একটি শক্তিশালী জারণ-বিজারণকারী বিক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র।**

শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তার প্রায় ৪৫% তাপশক্তিতে পরিণত হয় এবং বাকি ৫৫% ATP হিসেবে কোষে উপস্থিত থাকে। সে হিসেবে প্রাপ্ত শক্তির মোট পরিমাণ ৩৬০ কি. ক্যালরি। ATP-কে **জৈবিক মুদ্রা** (Biological coin) বলা হয়ে থাকে। মুদ্রার মতো দেহের যে কোন স্থানে তাৎক্ষণিক শক্তি চাহিদা মেটাতে ATP ব্যবহৃত হয়। একক সময়ে কোষে সামান্য পরিমাণ ATP জমা থাকে এবং তাই শ্বসনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ATP উৎপন্ন হয়। শ্বসন বন্ধ হলে ATP উৎপাদন বন্ধ হয় এবং কোষ তথা জীবের মৃত্যু ঘটে। এক অণু ATP প্রায় ১০,০০০-১২,০০০ ক্যালরি শক্তি ধারণ করে।

শ্বসনস্থল

প্রকৃতকোষী জীব : জীবদেহের প্রতিটি জীবকোষেই দিবা-রাত্রি শ্বসন সংঘটিত হয়। প্রয়োজনীয় এনজাইম থাকায় কোষের সাইটোপ্লাজমে শ্বসনের প্রথম পর্যায় (গ্লাইকোলাইসিস) সম্পন্ন হয়; কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়গুলো (যেমন- অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি, ক্রেবস চক্র ও ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম/চেইন) অর্থাৎ শক্তি উৎপাদনের অধিকাংশ বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে।

আদিকোষী জীব : ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল ইত্যাদিতে মাইটোকন্ড্রিয়া অনুপস্থিত। এদের ক্ষেত্রে মেসোজোম নামক কোষীয় গঠন শ্বসনের সংঘটনস্থল হিসেবে কাজ করে। আর শ্বসনের বিক্রিয়াগুলো কোষপর্দাস্থিত এনজাইমের সাহায্যে ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লোহিত রক্তকণিকায় মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকায়, এর মধ্যে ক্রেবস চক্র সম্পন্ন হয় না।

শ্বসন অঙ্গ : উদ্ভিদের প্রতিটি জীবন্ত কোষেই দিন-রাত্রি ২৪ ঘন্টা শ্বসনকার্য চলতে থাকে। কোষীয় সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়া শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ (মাইটোকন্ড্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

শ্বসনিক বস্তু : শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে যৌগিক বস্তুসমূহ জারিত হয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয় সেসব বস্তুকে শ্বসনিক বস্তু বলে। কার্বোহাইড্রেট (শর্করা), প্রোটিন (আমিষ), চর্বি এবং জৈবিক এসিডসমূহ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সূর্যালোকের আলোকশক্তিই এসব বস্তুতে রাসায়নিক স্থিতিশক্তি হিসেবে জমা থাকে এবং শ্বসনের ফলে স্থিতিশক্তি গতিশক্তি হিসেবে নির্গত হয়। কাজেই সূর্যালোকশক্তিই সকল শক্তির মূল উৎস।

CamScanner

ATP-কোষে শক্তির উৎস

ATP তৈরি : $ADP + Pi = ATP$, ATP তৈরির জন্যও শক্তির প্রয়োজন হয়। এই বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসে জৈবযৌগ ভাঙ্গনের মাধ্যমে। ATP কখনও এক কোষ থেকে অন্যকোষে স্থানান্তরিত হতে পারে না, অথচ সকল কোষের জন্যই নিরবিচ্ছিন্ন ATP সরবরাহ প্রয়োজন। এ কারণে প্রতিটি সজীব কোষেই শ্বসনের প্রয়োজন হয় যাতে করে প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরে জীবনের সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। তা এই প্রকার শ্বসনের নাম **কোষীয় শ্বসন** (Cellular respiration)।

তিনটি কারণে কোষের শক্তির প্রয়োজন হয় :

১. বড় জৈব অণু, যেমন DNA, RNA, প্রোটিন ইত্যাদি সংশ্লেষ করা।

২. সক্রিয় ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়ায় জৈব অণু বা আয়ন মেমব্রেনের মধ্যদিয়ে আদান-প্রদান করা।

৩. কোষের অভ্যন্তরে বস্তুসমূহকে (যেমন-ক্রোমোজোম, পেশিকোষে প্রোটিন তন্তু) এদিক-ওদিক পরিচালনা করা।

কোষের ভিতর যখন ATP ব্যবহৃত হয় তখন এর সবটুকুই তাপ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। তাপ শক্তি কোষকে গরম রাখতে প্রয়োজন হলেও কোষের কোনো কার্যক্রমে পুনঃব্যবহৃত হতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত পরিবেশে হারিয়ে যায়।

শ্বসনের কাজ

১. শ্বাসবায়ুর আদান-প্রদান : শ্বসনের সময় প্রতিটি জীবকোষে অক্সিজেন পৌঁছায় এবং শ্বসনজাত কার্বন ডাইঅক্সাইড দূরীভূত হয়।

২. শোষণ : ফুসফুসের মাধ্যমে O_2 এবং CO_2 ছাড়াও বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ (যেমন- CO, NO ইত্যাদি) প্রাণিদেহে শোষিত হয়।

৩. রেচন : শ্বসন প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া, কিটোন বডি, অ্যালকোহল, তেল, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় উদ্বায়ী পদার্থ দেহমুক্ত হয়।

৪. অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ভারসাম্য রক্ষা : দেহ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ হওয়ায় দেহকোষে অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

৫. পানির ভারসাম্য রক্ষা : শ্বসন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প বেরিয়ে যাওয়ায় দেহে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে।

৬. উষ্ণতার ভারসাম্য রক্ষা : নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছু পরিমাণ তাপ দেহমুক্ত হয়, ফলে দেহে তাপের ভারসাম্য বজায় থাকে।

৭. প্রকৃতিতে O_2 ও CO_2 এর ভারসাম্য রক্ষা : শ্বসনে উৎপন্ন CO_2 সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। আবার সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন O_2 শ্বসনে ব্যবহৃত হয়। এভাবে প্রকৃতিতে O_2 ও CO_2-এর ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

শ্বসনের প্রকারভেদ : অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে শ্বসন প্রক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. সবাত শ্বসন (Aerobic Respiration) ও খ. অবাত শ্বসন (Anaerobic Respiration)

ক. সবাত শ্বসন (Aerobic Respiration)

যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেনের সহায়তায় জীবকোষের শ্বসনিক বস্তু (প্রধানত গ্লুকোজ) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে সবাত শ্বসন বলে। সবাত শ্বসনের বিক্রিয়াগুলো সাইটোপ্লাজমের মাতৃকা বা সাইটোসলে এবং মাইটোকন্ড্রিয়নে ঘটে। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, সকল Protista, উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বসন হলো সবাত শ্বসন। তাই শ্বসন বলতে সবাত শ্বসনকেই বুঝায়।

গ্লুকোজকে প্রাথমিক শ্বসনিক বস্তু ধরলে সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণ নিম্নরূপ :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O + 36ADP + 36Pi \xrightarrow[\text{এনজাইম}]{\text{বিভিন্ন}} 6CO_2 + 12H_2O + 36ATP \text{ (শক্তি)}$$

সবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ জারিত হওয়ার জটিল প্রক্রিয়াকে বোঝার সুবিধার জন্য ৪টি পর্যায় বা ধাপে ভাগ করা যায় :

১. গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) : কোষের সাইটোপ্লাজমে (সাইটোসলে) শ্বসনের প্রথম পর্যায়ে গ্লুকোজ আংশিক জারিত হয়ে পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়।

২. **অ্যাসিটাইল Co-A (Acetyl Co-A) সৃষ্টি :** পাইরুভিক এসিড মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে (মাতৃকা) প্রবেশ করার পর জারিত হয়ে অ্যাসিটাইল Co-A (২ কার্বন) উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়াকে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াও বলা হয়, কারণ এখানে CO_2 এর অপসারণ ঘটে।

৩. **ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) :** অ্যাসিটাইল Co-A মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বহু জৈব এসিড উৎপাদনের মাধ্যমে চক্রাকার পথে জারিত হয়ে CO_2, H_2O এবং বিজারিত কো-এনজাইম $NADH+H^+$, $FADH_2$ উৎপন্ন করে।

৪. **ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম/চেইন (Electron Transport System/Chain) বা অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন (Oxidative Phosphorylation) :** ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন পর্যায় থেকে সৃষ্ট বিজারিত NAD বা FAD ইলেক্ট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের মাধ্যমে জারিত হয় এবং পরিশেষে বিজারিত যৌগগুলোর প্রোটন (H^+) ও পরিবাহিত ইলেক্ট্রন (e^-) অক্সিজেনের (O_2) সঙ্গে যুক্ত হয়ে H_2O তৈরি করে। ইলেক্ট্রন স্থানান্তরের সময় যে শক্তি নির্গত হয় তা ADP ও Pi (অজৈব ফসফেট) কে যুক্ত করে ATP অণু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। একে **প্রান্তীয় শ্বসন বা ইলেক্ট্রন স্থানান্তরন পদ্ধতিও** বলা হয়।

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার ধাপ বা পর্যায়সমূহ

সবাত শ্বসন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলেও বিক্রিয়ার স্থান ও কাজের ধারা অনুযায়ী একে একাধিক ধারাবাহিক ধাপ বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। পর্যায়গুলো হলো নিম্নরূপ :

প্রথম পর্যায় : গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) : স্থান– কোষের সাইটোপ্লাজম।

যে প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়, তাকে গ্লাইকোলাইসিস (গ্রিক. *glykos* = sugar এবং *lysis* = splitting) **বলে**। এ প্রক্রিয়ার জন্য কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না। গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম বা অভিন্ন ধাপ। [গ্লাইকোলাইসিসকে EMP (এই প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠাতা তিনজন বিজ্ঞানী Embden, Meyerhof and Parnas এর নাম অনুযায়ী) পাথওয়ে, শ্বসনের সাধারণ গতিপথ বা সাইটোপ্লাজমীয় শ্বসনও বলা হয়। উদ্ভিদে সঞ্চিত শ্বেতসার প্রথমে বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে জারিত হয়ে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয় এবং গ্লুকোজ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার প্রথম বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধাপের সব এনজাইম দ্রবণীয়।]

গ্লুকোজকে শ্বসনিক বস্তু ধরলে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

i. গ্লুকোজ অণু প্রথমে, ATP থেকে একটি ফসফেট গ্রহণ করে গ্লুকোজ ৬-ফসফেট যৌগ ও ADP প্রস্তুত করে। এ বিক্রিয়ায় **হেক্সোকাইনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

$$\text{গ্লুকোজ} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{হেক্সোকাইনেজ}} \text{গ্লুকোজ ৬-ফসফেট} + \text{ADP}$$

ii. **গ্লুকোজ ৬-ফসফেট ফসফোগ্লুকোআইসোমারেজ** নামক এনজাইমের প্রভাবে **ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেটে** পরিণত হয়।

$$\text{গ্লুকোজ ৬-ফসফেট} \xrightleftharpoons{\text{ফসফোগ্লুকোআইসোমারেজ}} \text{ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট}$$

iii. **ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ** এনজাইম ও ATP-র উপস্থিতিতে **ফ্রুক্টোজ ১, ৬-বিস ফসফেট** যৌগ ও ADP তৈরি করে। উৎপন্ন যৌগটি ৬-কার্বন যুক্ত।

$$\text{ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ}} \text{ফ্রুক্টোজ ১, ৬-বিস ফসফেট} + \text{ADP}$$

iv. **ফ্রুক্টোজ ১, ৬-বিস ফসফেট অ্যালডোলেজ** এনজাইমের প্রভাবে **৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রক্সি- অ্যাসিটোন ফসফেটে** রূপান্তরিত হয়।

$$\text{গ্লুকোজ ১, ৬-বিস ফসফেট} \xrightleftharpoons{\text{অ্যালডোলেজ}} \text{৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড} + \text{ডাই হাইড্রক্সি-অ্যাসিটোন ফসফেট}$$

v. **৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড থেকে গ্লাইকোলাইসিসের পরবর্তী বিক্রিয়া চলতে থাকে। এরপর ৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড H_3PO_4 দ্বারা ফসফরাসযুক্ত হয় এবং NAD^+ দ্বারা জারিত হয়ে ১, ৩-বিস-ফসফোগ্লিসারিক এসিডে পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি ফসফো গ্লিসার‍্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম দ্বারা সম্পন্ন হয়।**

$$\text{৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড} + NAD^+ + H_3PO_4 \xrightleftharpoons{\text{ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{১, ৩-বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড} + NADH + H^+$$

গ্লুকোজকে শ্বসনিক বস্তু ধরে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ছক

গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$)
(6–C) হেক্সোকাইনেজ — ATP, Mg^{++} → ADP
গ্লুকোজ ৬-ফসফেট
(6–C) ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ
ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট
(6–C) ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ — ATP, Mg^{++} → ADP
ফ্রুক্টোজ ১, ৬-বিসফসফেট
অ্যাল্ডোলেজ

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ৯টি বিক্রিয়ার মধ্যে ১ম, ৩য় ও শেষ– এই তিনটি বিক্রিয়া একমুখী, অন্যসবগুলো দ্বিমুখী।

৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (3–C) ⇄ ট্রায়োজ আইসোমারেজ ⇄ ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট (3–C)

ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ — NAD + Pi, $+H_2O$ → $NADH+H^+$

১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড
(3–C) ফসফোগ্লিসারিক এসিড কাইনেজ — ADP → ATP
৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড
(3–C) ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ
২-ফসফোগ্লিসারিক এসিড
(3–C) ইনোলেজ — $2H_2O$
২-ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড
পাইরুভিক এসিড কাইনেজ — ADP → ATP
পাইরুভিক এসিড (এক অণু) $CH_3 – CO – COOH$
(3 – C)

১ অণু গ্লুকোজ (৬ কার্বন)
ATP → ADP
গ্লুকোজ ৬-ফসফেট
ATP → ADP
২ অণু ট্রায়োজ (৩ কার্বন)
2NAD + 2Pi → $2NADH+H^+$
2ADP → 2ATP
2ADP → 2ATP
২ অণু পাইরুভিক এসিড
(গ্লাইকোলাইসিস : সংক্ষিপ্ত রূপ)

চিত্র ৯.৪.১ : গ্লাইকোলাইসিসের বিভিন্ন ধাপ

vi. ১, ৩-বিস ফসফোগ্লিসারিক এসিড ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় ফসফরাস বিযুক্ত হয়ে ADP-র সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ATP গঠন করে।

১, ৩ বিস ফসফোগ্লিসারিক এসিড + ADP ⇌ (ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ) ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড + ATP

vii. ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ নামক এনজাইমের সহায়তায় ২-ফসফোগ্লিসারিক এসিডে পরিণত হয়।

৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড ⇌ (ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ) ২-ফসফোগ্লিসারিক এসিড

viii. ২-ফসফোগ্লিসারিক এসিড পরবর্তী পর্যায়ে **ইনোলেজ** এনজাইমের প্রভাবে এক অণু পানি ত্যাগ করে ২-ফসফোইনোল পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন করে।

২-ফসফোগ্লিসারিক এসিড $\xrightleftharpoons{\text{ইনোলেজ}}$ ২-ফসফোইনোল পাইরুভিক এসিড + H_2O

ix. গ্লাইকোলাইসিসের শেষ পর্যায়ে **পাইরুভেট কাইনেজ** এনজাইমের প্রভাবে ২-ফসফোইনোল পাইরুভিক এসিড থেকে ফসফেট মুক্ত হয়ে ATP ও পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন হয়।

২-ফসফোইনোল পাইরুভিক এসিড + ADP $\xrightarrow{\text{পাইরুভেট কাইনেজ}}$ পাইরুভিক এসিড + ATP

গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়ার ৯টি বিক্রিয়ার মধ্যে ১ম, ৩য় এবং শেষ-এই ৩টি বিক্রিয়া **একমুখী, অন্যসবগুলো** দ্বিমুখী।

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপাদন : ATP (দুই অণু), NADH + H^+ (দুই অণু) এবং পাইরুভিক এসিড (দুই অণু)।

ATP ও NADH + H^+ হলো শক্তি অণু।

গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ- ১, ৬-বিসফসফেট হওয়া পর্যন্ত দুই অণু ATP খরচ হয় এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক ট্রায়োজ (৩-কার্বনবিশিষ্ট গ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন) হতে পাইরুভিক এসিড হওয়া পর্যন্ত দুই অণু ATP এবং এক অণু NADH + H^+ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দুই অণু ট্রায়োজ হতে মোট চারটি ATP এবং দুটি NADH + H^+ উৎপন্ন হয়। কাজেই দেখা যায় তৈরিকৃত ৪ অণু ATP হতে প্রথমে ব্যবহৃত দুই অণু ATP বাদ দিলে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় নিট দুটি ATP ও NADH + H^+ জমা হয়। গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে। এর সবকটি এনজাইম দ্রবণীয়।

$NADH_2$ না লিখে NADH + H^+ লেখা হয় কেন ? কারণ NAD^+ কে বিজারণের জন্য, বিজারণ অণু ২টি হাইড্রোজেন এটম ($2e^- + 2H^+$) প্রদান করে থাকে। NAD^+ অণুর মাথার রিং স্ট্রাকচার ২টি ইলেক্ট্রন ($2e^-$) এবং ১টি প্রোটন (H^+) গ্রহণ করে, অপর প্রোটন (H^+) পৃথকভাবে সাইটোসোলে মুক্ত অবস্থায় থাকে। তাই বিজারিত NAD কে $NADH_2$-এভাবে প্রকাশ না করে, NADH + H^+-এভাবে প্রকাশ করা হয়।

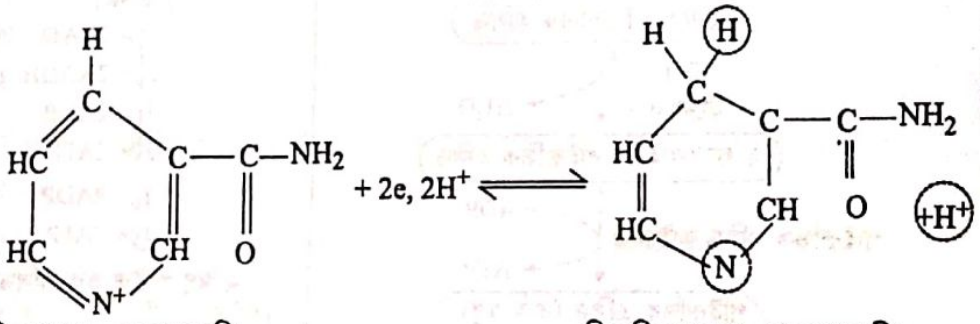

জারিত NAD-এর মাথায় রিং বিজারিত NAD-এর মাথায় রিং

একই কারণে $NADP^+$ কে বিজারিত অবস্থায় NADPH + H^+ হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

গ্লাইকোলাইসিস- এর নিয়ন্ত্রণ

১. গ্লাইকোলাইসিস ত্বরান্বিত হয় ATP-এর ব্যবহার দ্রুত হলে, ATP-এর ব্যবহার হ্রাস পেলে প্রক্রিয়ার হার কমে যায়।

২. গ্লুকোজ-এর প্রাপ্তি তথা সরবরাহের পরিমাণ এ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. অ্যালোস্টেরিক এনজাইম 'ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ' যা ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ ১, ৬, বিসফসফেট তৈরি করতে সহায়তা করে, তার গতিময়তার উপর গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া বহুলাংশে নির্ভরশীল। ATP দ্বারা এর কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ADP দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়।

গ্লাইকোলাইসিসের গুরুত্ব/ তাৎপর্য-

১. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যে ATP এবং NADH + H^+ পাওয়া যায় তা মোট সুপ্ত শক্তির মাত্র ১৭% । ৩% শক্তি তাপশক্তি হিসেবে বেরিয়ে যায় এবং প্রায় ৮০% শক্তি পাইরুভিক এসিডের মধ্যে তখনও জমা থাকে ।

২. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পাইরুভিক এসিড (অ্যাসিটাইল Co-A হয়ে) ক্রেসব চক্রের সাবস্ট্রেট হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

৩. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উপজাত পদার্থ ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট স্নেহ পদার্থের বিপাকের সাথে শর্করা জাতীয় পদার্থের বিপাকের সংযোগ স্থাপন করে ।

৪. পাইরুভিক এসিড থেকে অ্যামিনো এসিডও উৎপন্ন হতে পারে ।

৫. সকল প্রকার জীবকোষে গ্লাইকোলাইসিস গ্লুকোজ জারণের একটি সাধারণ পর্যায় ।

৬. পাইরুভিক এসিড সৃষ্টিই এ প্রক্রিয়ার মুখ্য বিষয় । পাইরুভিক এসিড সৃষ্টি না হলে শ্বসন বন্ধ হয়ে যাবে, আর শ্বসন বন্ধ হলে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে ।

৭. এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একাধিক কোষীয় উপাদান বা অন্তর্বর্তী যৌগ জীবের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয় ।

গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis) : গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার উল্টো পথে গ্লুকোজ তৈরি হওয়াকে বলা হয় গ্লুকোনিওজেনেসিস । এটি প্রাণীর চেয়ে উদ্ভিদে কম হয়, তবে রেড়ি বীজ, সূর্যমুখী বীজ ইত্যাদিতে জমাকৃত তেল গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় সুকরোজ বা গ্লুকোজ-এ পরিণত হয় যা পরবর্তীতে বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় ।

100%

গ্লাইকোলাইসিস ও ফটোলাইসিস এর মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	গ্লাইকোলাইসিস	ফটোলাইসিস
১. সংঘটনের প্রক্রিয়া	শ্বসনকালে ঘটে ।	সালোকসংশ্লেষণকালে ঘটে ।
২. সংঘটনের স্থান	কোষের সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয় ।	ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানাম অঞ্চলে সম্পন্ন হয় ।
৩. আলো	সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না ।	সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় ।
৪. উৎপন্ন দ্রব্য	এ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন হয় ।	এ প্রক্রিয়ায় পানি থেকে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয় ।
৫. প্রক্রিয়ার নাম	এ প্রক্রিয়াকে EMP পথ বলে ।	এ প্রক্রিয়াটি হিল বিক্রিয়া তুল্য ।

দ্বিতীয় পর্যায় : অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি (Formation of Acetyl Co-A) : স্থান–মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স ।

গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন পাইরুভিক এসিড (৩ কার্বন) ক্রেবস চক্রে প্রবেশের পূর্বে মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করে এবং একটি জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিটাইল Co-A (২ কার্বনযুক্ত) সৃষ্টি করে এবং পরে ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে । এ বিক্রিয়ায় পাইরুভিক ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম ভূমিকা রাখে । এটি পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে এবং CO_2 মুক্ত হয়, কাজেই এটি একটি অক্সিডেটিভ ডিকার্বোক্সিলেশন প্রক্রিয়া । [গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন পাইরুভিক এসিড মাইটোকন্ড্রিয়নের বহিঃঝিল্লির (outer membrane) ছিদ্রপথে সহজেই ভিতরে প্রবেশ করে এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের (OH^-) বিনিময়ে পাইরুভেট ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে আন্তঃঝিল্লি (inner membrane) অতিক্রম করে মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করে ।]

বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ

I. **ডিকার্বোক্সিলেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে পাইরুভিক এসিড TPP (Thiamine Pyrophosphate)- এর সাথে বিক্রিয়া করে ১ অণু CO_2 হারিয়ে TPP- যৌগ তৈরি করে । [TPP = এটি ডিকার্বোক্সিলেজ এনজাইমের কো-এনজাইম]

$$\text{পাইরুভিক এসিড} + ATP \xrightarrow{\text{ডিকার্বোক্সিলেজ}} TPP\text{- যৌগ} + CO_2$$

ii. **ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে TPP- যৌগ লাইপোয়িক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিটাইল লাইপোয়িক এসিড যৌগ গঠন করে এবং TPP মুক্ত হয়ে যায়।

$$\text{TPP - যৌগ} + \text{লাইপোয়িক এসিড} \xrightarrow{\text{ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ}} \text{অ্যাসিটাইল লাইপোয়িক এসিড যৌগ} + \text{TPP}$$

iii. অ্যাসিটাইল লাইপোয়িক এসিড যৌগ, কো-এনজাইম-এ (Co- A) এর সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি করে এবং লাইপোয়িক এসিড বিজারিত হয়।

$$\text{অ্যাসিটাইল লাইপোয়িক এসিড যৌগ} + \text{Co-A} \longrightarrow \text{অ্যাসিটাইল Co-A} + \text{লাইপোয়িক এসিড (বিজারিত)}$$

iv. পরে NAD, বিজারিত লাইপোয়িক এসিড হতে দুটি হাইড্রোজেন গ্রহণ করে $NADH + H^+$-তে পরিণত হয় এবং লাইপোয়িক এসিড জারিত হয়।

$$\text{লাইপোয়িক এসিড (বিজারিত)} + \text{NAD} \longrightarrow \text{লাইপোয়িক এসিড (জারিত)} + NADH + H^+$$

সংক্ষেপে, সামগ্রিক বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$\text{পাইরুভিক এসিড} + \text{Co-A} + \text{NAD} \xrightarrow[\text{লাইপোয়িক এসিড}]{\text{TPP}} \text{অ্যাসিটাইল Co-A} + CO_2 + NADH + H^+$$

কাজেই দেখা যায়, গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ১ অণু পাইরুভিক এসিড থেকে ১ অণু CO_2 ও ১ অণু NADH $+ H^+$ উৎপাদনপূর্বক ১ অণু অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি হয়। ফলে ১ অণু গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন ২ অণু পাইরুভিক এসিড থেকে ২ অণু CO_2, ২ অণু $NADH + H^+$ এবং ২ অণু অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় পর্যায় : সাইট্রিক এসিড চক্র বা ক্রেবস চক্র : স্থান—মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স।

পাইরুভিক এসিড থেকে উৎপাদিত ২-কার্বন বিশিষ্ট যৌগ অ্যাসিটাইল Co-A একটি জটিল চক্রের মাধ্যমে জারিত হয়ে CO_2 এবং পানি প্রস্তুত করে। এ চক্রটির বিশদ বিবরণ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রাণরসায়নবিদ **স্যার হ্যানস ক্রেবস** (Sir Hans Adolf Krebs, 1900- 1981) প্রদান করেছিলেন। এজন্য তাঁর নামানুসারে এ চক্রকে **ক্রেবস চক্র** বলা হয়। এ চক্রের প্রথম উৎপাদিত যৌগ সাইট্রিক এসিড হওয়ায় ক্রেবস চক্রকে **সাইট্রিক এসিড চক্র** (Citric Acid Cycle)- ও বলে। সাইট্রিক এসিডে তিনটি কার্বক্সিল (–COOH) গ্রুপ থাকায় একে বর্তমানে **ট্রাই কার্বক্সিলিক এসিড চক্র** বা টিসিএ চক্র (Tricarboxylic Acid Cycle বা TCA Cycle) বলে। ক্রেবস চক্রের সমগ্র বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার মাতৃকার মধ্যে সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, পাইরুভিক এসিডের সবাত জারণ (Aerobic Oxidation of Pyruvic Acid) ক্রেবস চক্রের মাধ্যমেই ঘটে।

ক্রেবস চক্রের বৈশিষ্ট্য

১. সাইট্রিক এসিড চক্র কোষীয় শ্বসনের তৃতীয় ধাপ। এ চক্রের প্রধান কাঁচামাল অ্যাসেটিল Co- A.
২. এ চক্র কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় সম্পন্ন হয় এবং সবাত শ্বসনে সীমাবদ্ধ থাকে।
৩. এটি একটি চক্রাকার জারণ প্রক্রিয়া এবং এর প্রতিটি ধাপ সুনির্দিষ্ট এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৪. সাইট্রিক এসিড চক্রে কোনো শক্তি (ATP) ব্যবহৃত হয় না।
৫. এ চক্রে 2 অণু GTP/ ATP, 8 অণু $NADH_2$, 2 অণু $FADH_2$ এবং 6 অণু CO_2 উৎপন্ন হয়।

ক্রেবস চক্রের মূল বিক্রিয়াসমূহ

নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে ক্রেবস চক্র সম্পন্ন হয়। যথা-

১. পাইরুভিক এসিড থেকেই ক্রেবস চক্রের শুরু ধরা হলেও এটি মূলত অ্যাসিটাইল Co-A হিসেবে ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে মূল চক্রের সূচনা করে। অতঃপর সাইট্রেট সিনথেজের (একে কনডেনসিং এনজাইম বলে) কার্যকারিতায় অ্যাসিটাইল Co-A (২ কার্বন) এক অণু পানি সহযোগে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিডের (৪ কার্বন) সাথে বিক্রিয়া করে সাইট্রিক এসিড (৬ কার্বন) তৈরি করে এবং Co-A মুক্ত হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী। (ম্যাট্রিক্সে স্থায়ী আবাসনের জন্য অক্সালো অ্যাসিটিক এসিডকে আবাসিক অণু বলা হয়)

$$\text{অ্যাসিটাইল Co-A} + \text{অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড} + H_2O \xrightarrow{\text{সাইট্রেট সিন্থেজ}} \text{সাইট্রিক এসিড} + \text{Co-A}$$

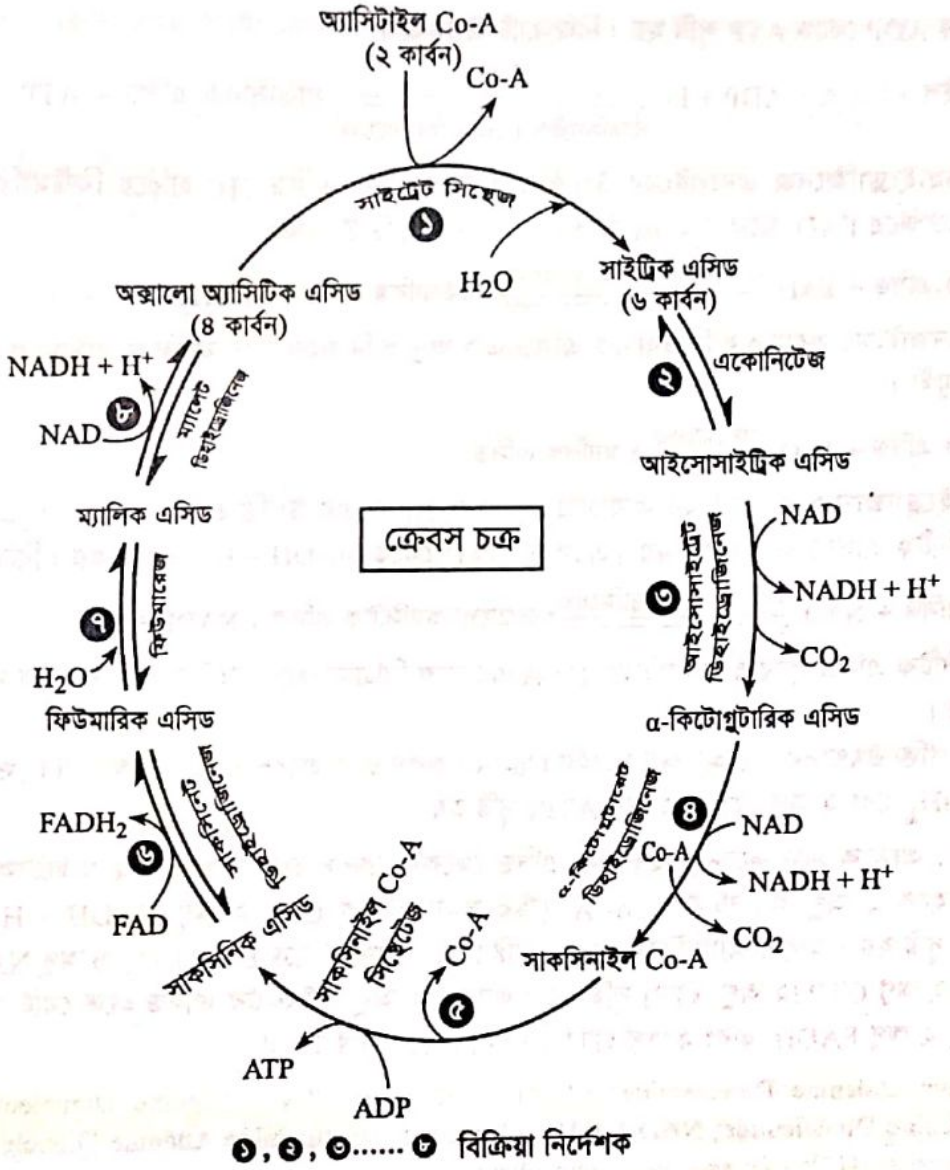

চিত্র ৯.৪.২ : ক্রেবস চক্রের ছক (সরলীকৃত) [আধুনিক ধারণা অনুযায়ী দুটি স্টেপ কম দেখিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে]

২. সাইট্রিক এসিড **একোনিটেজ** এনজাইমের সহায়তা **আইসোসাইট্রিক** এসিড-এ পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি উভমুখী।

সাইট্রিক এসিড $\xrightleftharpoons{\text{একোনিটেজ}}$ আইসোসাইট্রিক এসিড

৩. আইসোসাইট্রিক এসিড এরপর **আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইমের সহায়তায় α-কিটোগ্লুটারিক এসিড-এ পরিণত হয়। এক্ষেত্রে NAD বিজারিত হয়ে $NADH + H^+$ এ পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

আইসোসাইট্রিক এসিড + NAD $\xrightarrow{\text{আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ}}$ α- কিটোগ্লুটারিক এসিড + $NADH + H^+ + CO_2$

৪. **α-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইমের সহায়তায় α-কিটোগ্লুটারিক এসিড Co-A এর সঙ্গে মিলিত হয়ে **সাকসিনাইল Co-A** গঠন করে। এ সময় এক অণু CO_2 মুক্ত হয় এবং NAD হতে $NADH + H^+$ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

α-কিটোগ্লুটারিক এসিড + Co-A $\xrightarrow{\text{α-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ}}$ সাকসিনাইল Co-A + CO_2 + $NADH + H^+$

৫. **সাকসিনাইল Co-A সিনথেটেজ** এনজাইমের কার্যকারিতায় সাকসিনাইল Co-A থেকে Co-A মুক্ত হয়ে সাকসিনিক এসিড-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় এক অণু পানি যুক্ত হয়। এ সময় প্রাণীতে GDP থেকে GTP সৃষ্টি

হয় কিন্তু উদ্ভিদে ADP থেকে ATP সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি উভমুখী।

$$\text{সাকসিনাইল} + \text{Co-A} + \text{ADP} + \text{Pi} \underset{\text{সাকসিনাইল Co-A সিনথেটেজ}}{\overset{+H_2O}{\rightleftharpoons}} \text{সাকসিনিক এসিড} + \text{ATP} + \text{Co-A}$$

৬. **সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে সাকসিনিক এসিড $2H^+$ হারিয়ে **ফিউমারিক এসিড-এ** পরিণত হয়। এক্ষেত্রে FAD থেকে $FADH_2$ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি উভমুখী।

$$\text{সাকসিনিক এসিড} + \text{FAD} \underset{}{\overset{\text{সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ}}{\rightleftharpoons}} \text{ফিউমারিক এসিড} + FADH_2$$

৭. **ফিউমারেজ** এনজাইমের সহায়তায় ফিউমারিক এসিড এক অণু পানি গ্রহণ করে **ম্যালিক এসিড-এ পরিণত হয়।** বিক্রিয়াটি উভমুখী।

$$\text{ফিউমারিক এসিড} + H_2O \underset{}{\overset{\text{ফিউমারেজ}}{\rightleftharpoons}} \text{ম্যালিক এসিড}$$

৮. **ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইমের কার্যকারিতায় এবং NAD এর উপস্থিতিতে ম্যালিক এসিড $2H^+$ হারিয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিডে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে NAD থেকে NADH + H+ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি উভমুখী।

$$\text{ম্যালিক এসিড} + \text{NAD} \underset{}{\overset{\text{ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ}}{\rightleftharpoons}} \text{অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড} + \text{NADH} + H^+$$

অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড পুনরায় অ্যাসিটাইল Co-A এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাইট্রিক এসিড সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেবস চক্র চালু রাখে।

ক্রেবস চক্রে শক্তি উৎপাদন : ২ অণু অ্যাসিটাইল Co- A ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করলে **৪ অণু CO_2, ৬ অণু NADH + H^+, ২ অণু $FADH_2$** এবং ২ অণু GTP (২ অণু ATP) সৃষ্টি হয়।

[বিশেষ তথ্য : অনেকে মনে করেন পাইরুভিক এসিড থেকেই ক্রেবস চক্রের শুরু, তাই মাইটোকন্ড্রিয়নে ২ অণু পাইরুভিক এসিড হতে ২ অণু অ্যাসিটাইল Co- A সৃষ্টির সময় ২ অণু CO_2, ২ অণু NADH + H^+ এবং ২ অণু অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি হয়। আবার অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির পরে ক্রেবস চক্রে ৪ অণু CO_2, ৬ অণু NADH + H^+, ২ অণু $FADH_2$ এবং ২ অণু GTP (২ অণু ATP) সৃষ্টি হয়। কাজেই ২ অণু পাইরুভিক এসিড হতে মোট ৬ অণু CO_2, ৮ অণু NADH + H^+, ২ অণু $FADH_2$ এবং ২ অণু GTP (২ অণু ATP) সৃষ্টি হয়।]

[FAD = Flavin Adenine Dinucleotide; $FADH_2$ = Reduced Flavin Adenine Dinucleotide; NAD = Nicotinamide Adenine Dinucleotide; NADH + H^+ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide; GDP = Guanosine Diphosphate; GTP = Guanosine Triphosphate]

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রেবস চক্রের পার্থক্য

১. সাকসিনাইল Co- A সিন্থেটেজ উদ্ভিদে ATP তৈরি করে কিন্তু প্রাণীতে GTP তৈরি হয় এবং GTP পরে একটি এনজাইম বিক্রিয়ার মাধ্যমে ATP- তে রূপান্তরিত হয়।

২. এখন পর্যন্ত পরীক্ষাকৃত সকল উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়াতে NAD- malic enzyme পাওয়া গেছে। এই এনজাইম ম্যালিক এসিডকে (ম্যালেট) পাইরুভিক এসিডে রূপান্তরিত করে, যা অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। প্রাণীতে এরূপ বিক্রিয়া ঘটে না।

ক্রেবস চক্রের গুরুত্ব/ তাৎপর্য

১. প্রতিটি জীবের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (অর্থাৎ খনিজ লবণ শোষণ, পানি শোষণ, পরিবহন, বৃদ্ধি, চলন, পুষ্পায়ন ইত্যাদি কাজ) ক্রেবস চক্র থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ক্রেবস চক্র হলো শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র।

২. ক্রেবস চক্রে উৎপাদিত একাধিক জৈব এসিড উদ্ভিদের অ্যামিনো এসিড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

৩. শর্করা, ফ্যাটি এসিড এবং অ্যামিনো এসিড জারণের সাধারণ পথ হচ্ছে ক্রেবস চক্র। জীবকোষে অধিকাংশ বিজারিত কো-এনজাইম $NADH_2$ (NADH + H^+), $FADH_2$ এই পথে সংশ্লেষিত হয়।

৪. ক্লোরোফিল, সাইটোক্রোম, ফাইকোবিলিন, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি তৈরির উৎস সাকসিনাইল Co-A ক্রেবস চক্রের অন্যতম যৌগ।

৫. এ চক্রে উৎপন্ন অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড পিরিমিডিন (সাইটোসিন, থাইমিন), অ্যালকালয়েড যৌগ (পোরোফাইরিন, হিম ইত্যাদি) গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

৬. এ চক্রে উৎপাদিত α-কিটোগ্লুটারিক এসিড ও অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড নাইট্রোজেন বিপাকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

৭. ক্রেবস চক্রে উৎপন্ন বিভিন্ন জৈব এসিড সাধারণভাবে উদ্ভিদের ও প্রাণিদের জৈব এসিড বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

৮. এ চক্রের মাধ্যমে শর্করা বিপাকের সাথে নাইট্রোজেন বিপাকের সংযোগ ঘটায়।

৯. প্রতি অণু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণে ক্রেবস চক্র থেকে ২৪ অণু ATP উৎপন্ন হয়।

১০. ক্রেবস চক্র অপচিতিমূলক বিপাকীয় পথের একটি পর্যায় হলেও এই পথে সংশ্লেষিত বহু জৈব যৌগ উপচিতিমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই একে **অ্যাম্ফিবোলিক পথ** (amphibolic pathway, একই সঙ্গে অপচিতি ও উপচিতিমূলক ক্রিয়া উভয়ই পরিলক্ষিত হয়) বলা হয়।

১১. শ্বসনে আমরা যে CO_2 ত্যাগ করি তা এ চক্র থেকেই উৎপন্ন হয়।

১২. গ্লাইঅক্সিলেট চক্রের (glyoxylate cycle) সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে।

গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	গ্লাইকোলাইসিস	ক্রেবস চক্র
১. পর্যায়	এটি শ্বসনের প্রথম পর্যায়।	এটি সবাত শ্বসনের তৃতীয় পর্যায়।
২. সংঘটনের স্থান	কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে।	মাইটোকন্ড্রিয়নের ধাত্রে ঘটে।
৩. পথ	এটি সোজা পথ (straight pathway)।	এটি চক্রাকার পথ (cyclic pathway)।
৪. ATP	মাত্র ২ অণু ATP ব্যয় হয়।	ATP ব্যয় হয় না।
৫. অক্সিজেন	প্রয়োজন হয় না।	প্রয়োজন হয়।
৬. কার্বন ডাইঅক্সাইড	CO_2 উৎপন্ন হয় না।	CO_2 উৎপন্ন হয়।
৭. জারণ	শ্বসন বস্তুর আংশিক জারণ ঘটে।	শ্বসন বস্তুর সম্পূর্ণ জারণ ঘটে।
৮. উৎপন্ন পদার্থ	এতে ১ অণু গ্লুকোজের জারণে নিট ২ অণু ATP ও ২ অণু $NADH + H^+$ তৈরি হয়।	সমগ্র পর্যায়টিতে (অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি থেকে) ৮ অণু $NADH + H^+$, ২ অণু $FADH_2$ ও ২ অণু ATP/ GTP সৃষ্টি হয়।
৯. প্রক্রিয়ার নাম	অপর নাম EMP পথ।	অপর নাম সাইট্রিক এসিড চক্র বা TCA চক্র।

চতুর্থ পর্যায় : ইলেক্ট্রন স্থানান্তর ও অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন : স্থান – মাইটোকন্ড্রিয়্যাল মেমব্রেন।

এ ধাপে **ইলেক্ট্রন স্থানান্তর ও ATP উৎপন্ন হয়।** শ্বসনের ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপে সৃষ্ট $NADH + H^+$ ও $FADH_2$ হতে ইলেক্ট্রন, একটি ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের (ETC) মাধ্যমে O_2 এ স্থানান্তর হয়।

ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (যে চেইনের মাধ্যমে ইলেক্ট্রন স্থানান্তর হয়) একটি একক প্রোটিন এবং তিনটি মাল্টিপ্রোটিন কমপ্লেক্স নিয়ে গঠিত এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার মেমব্রেনে অবস্থিত। কমপ্লেক্সসমূহ নিম্নরূপ :

i. **কমপ্লেক্স- I :** NADH ডিহাইড্রোজিনেজ (মাল্টিপ্রোটিন)
ii. **কমপ্লেক্স- II :** সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ (একক পেরিফেরাল প্রোটিন)
iii. **কমপ্লেক্স- III :** সাইটোক্রোম কমপ্লেক্স (মাল্টিপ্রোটিন)
iv. **কমপ্লেক্স- IV :** সাইটোক্রোম অক্সিডেজ (মাল্টিপ্রোটিন)

CamScanner

এক কমপ্লেক্স থেকে অপর কমপ্লেক্সে ইলেক্ট্রন প্রবাহ দুইটি চলনশীল (mobile) ইলেকট্রন সাটল (shuttle) এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। একটি সাটল হলো ইউবিকুইনোন (UQ) যা মেমব্রেনের মাঝখানে থাকে। এটি ইলেক্ট্রনকে কমপ্লেক্স I ও II হতে কমপ্লেক্স III এ নিয়ে যায়। আরেকটি সাটল হলো সাইটোক্রোম-c (Cyt.c) যা দুই মেমব্রেনের (বহিঃ ও অন্তঃ) মাঝখানে খালি জায়গায় থাকে। এটি কমপ্লেক্স III থেকে ইলেক্ট্রন কমপ্লেক্স IV এ নিয়ে যায়।

ইলেক্ট্রন প্রবাহ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ

১. ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের (ETC) কমপ্লেক্স I, $NADH + H^+$ হতে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে UQ এর মাধ্যমে কমপ্লেক্স III তে পৌছায়। $NADH + H^+$ ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে NAD^+ (অক্সিডাইজড)তে পরিণত হয়।

২. $FADH_2$ হতে ইলেকট্রন কমপ্লেক্স II গ্রহণ করে UQ এর মাধ্যমে কমপ্লেক্স III তে পৌছায়। $FADH_2$ অক্সিডাইজড হয়ে FAD^+ হয়।

৩. কমপ্লেক্স III হতে ইলেক্ট্রন সাইটোক্রোম-c (Cyt.c) এর মাধ্যমে কমপ্লেক্স- IV এ পৌছায়।

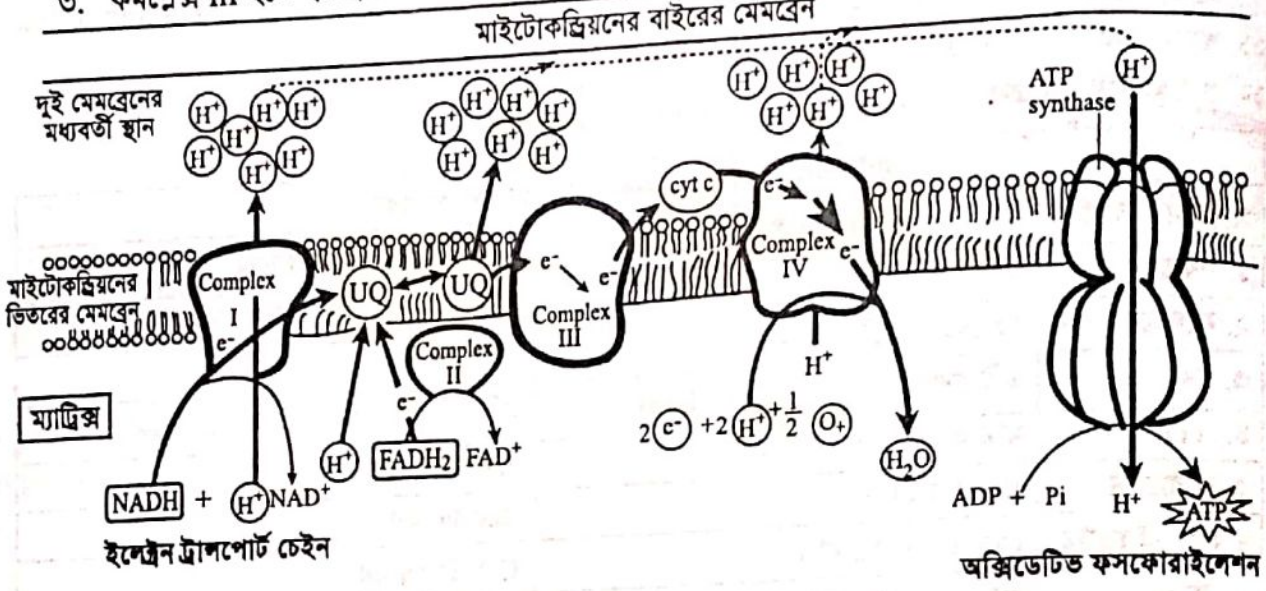

৪. মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাটিক্স-এ বিদ্যমান অক্সিজেন, কমপ্লেক্স IV হতে দুটি ইলেক্ট্রন এবং ম্যাট্রিক্স হতে দুটি প্রোটন ($2H^+$) গ্রহণ করে এক অণু পানি (H_2O) তৈরি করে। অক্সিজেনের শক্তিশালী ইলেক্ট্রোনেগিটিভিটির কারণে সৃষ্ট আকর্ষণে চেইনের মধ্যদিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অক্সিজেনের সাথে মিলিত হয়ে পানি তৈরি করে। **ETC তে কোনো ATP তৈরি হয় না।**

$$2H^+ + \frac{1}{2}O_2 + 2e^- \text{ (কমপ্লেক্স IV থেকে নির্গত)} \rightarrow H_2O$$

কাজেই ETC-এ ইলেক্ট্রন সর্বশেষ গ্রহীতা হলো অক্সিজেন। ETC সবাত শ্বসনের একটি পর্যায় মাত্র, এ পর্যায় ছাড়া সবাত শ্বসন পূর্ণ হয় না। শ্বসনের সর্বশেষ এ পর্যায়েই আণবিক O_2 ব্যবহৃত হয় এবং এ বিক্রিয়াকে **চূড়ান্ত শ্বসনিক পর্যায় বা প্রান্তীয় শ্বসন বা টারমিনাল শ্বসন** (terminal respiration) বলে।

অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন : ATP তৈরি : ETC এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রন স্থানান্তরকালে নির্গত শক্তির সাহায্যে ADP ও Pi যুক্ত হয়ে ATP সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন**। ETC-এ কোনো ATP তৈরি হয় না, ATP তৈরি হয় **কেমিঅসমোসিস প্রক্রিয়ায়**। কেমিঅসমোসিস হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট-এর শক্তি এবং ATP Synthase এনজাইম ব্যবহার করে ATP তৈরি হয়।

ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে ইলেক্ট্রন প্রদান করা কালে $NADH + H^+$, $FADH_2$ হতে বেশ পরিমাণ মুক্ত শক্তি (free energy) সৃষ্টি হয়। এই মুক্ত শক্তি খরচ করে পাম্পিং-এর মাধ্যমে ম্যাট্রিক্স থেকে প্রোটিন (H+) মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার

মেমব্রেন পার করে দুই মেমব্রেনের মাঝখানে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে ম্যাট্রিক্স-এ প্রোটন খুবই কম থাকে কিন্তু দুই মেমব্রেনের ফাঁকা স্থানে প্রোটন অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। প্রোটন ঘনত্বের এ পার্থক্যকে Proton gradient বলে, এই Proton gradient এক প্রকার শক্তি। মেমব্রেনের দুপাশে প্রোটনের ঘনত্বের পার্থক্য এবং ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল পার্থক্য একটি শক্তি তৈরি করে যাকে Proton-motive force বলে। কোষের Proton-motive force ব্যবহার করে কাজ করাকে বলা হয় কেমিঅসমোসিস।

ব্রিটিশ প্রাণ-রসায়নবিদ **Peter Mitchell** ATP সৃষ্টির এ প্রক্রিয়াটি প্রস্তাব করেছিলেন যার কারণে তাঁকে ১৯৭৮ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাইটোকন্ড্রিয়াতে কেমিঅসমোসিসের শক্তি আসে NADH + H^+, $FADH_2$ ইত্যাদি উচ্চশক্তি সম্পন্ন অণুর অক্সিডেশনের মাধ্যমে। তাই এর নাম অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন।

ATP Synthase : এটি একটি আণবিক মটরবিশেষ। এর তিনটি অংশ আছে। যথা-গোড়া, মধ্যম অংশ বোঁটাবিশেষ এবং মোটা মাথার অংশ। গোড়ার অংশ মাইটোকন্ড্রিয়ানের ইনার মেমব্রেনে গ্রথিত থাকে এবং মাথা ম্যাট্রিক্স পর্যন্ত বর্ধিত থাকে। গোড়ার অংশ একটি সরু পথ তৈরি করে দেয় যার মধ্যদিয়ে প্রোটন (H^+) মুক্তভাবে চলার মাধ্যমে ম্যাট্রিক্স-এ পৌছাতে পারে। মাথার অংশ ঘূর্ণনের মাধ্যমে ADP + iP যুক্ত করে ATP তৈরিতে সহায়তা করে। **মাথার এই ঘূর্ণন অংশ প্রকৃতিতে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম রোটারি মটর।**

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের কাজ হলো NADH + H^+ এবং $FADH_2$ এর ইলেকট্রন ম্যাট্রিক্স-এর অক্সিজেনে প্রবাহিত করা।

উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়নের স্বকীয়তা

১. একটি বহিঃস্থ (ETC এর বাইরে) NADH + H^+ ডিহাইড্রোজিনেজ যা সরাসরি সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন NADH + H^+ থেকে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করতে পারে। এই ইলেক্ট্রন পরে ETC-এর ইউবিকুইনোন পুল-এ প্রবেশ করে এবং ২টি (৩টি নয়) ATP উৎপন্ন করে।

২ ম্যাট্রিক্স NADH + H^+ অক্সিডাইজ করার জন্য দুটি পথ আছে।

৩. অক্সিজেন রিডাকশনের জন্য বিকল্প পথ। এ বিকল্প অক্সিডেজ, সাইটোক্রোম-c অক্সিডেজের মতো নয়। এটি সায়ানাইড, অ্যাজাইড (azide) বা কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা বাধাগ্রস্ত (inhibition) হয় না। তাই এখানে সায়ানাইড প্রতিরোধী শ্বসন হয় যা প্রাণীতে হয় না।

অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা : সবাত শ্বসনের সব পর্যায়ে অক্সিজেন-এর প্রয়োজন হয় না। অক্সিজেন-এর প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ETC-এর শেষ পর্যায়ে কমপ্লেক্স IV থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য। এক পরমাণু অক্সিজেন দুটি ইলেকট্রন ও ম্যাট্রিক্স থেকে দুটি প্রোটন ($2H^+$) গ্রহণ করে এক অণু পানি (H_2O) তৈরি করে। কোষে অক্সিজেন-এর অভাব হলে ETC-এর ইলেকট্রনের শেষ বাহক সাইটোক্রোম-সি থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করার কেউ থাকে না, তাই সাইটোক্রোম-সি ইলেকট্রন মুক্ত করতে না পেরে পূর্ববর্তী বাহক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষমতা হারায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে পেছনের সবগুলো বাহকই ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এর ফলে প্রথমে ETC, পরে সাইট্রিক এসিড চক্র, পাইরুভিক এসিডের অক্সিডেশন এবং সর্বশেষ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটিও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ATP উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, তাই কোষ তার গঠন ও কার্যাবলি চালিয়ে যাবার মতো শক্তি ATP না পেয়ে মরে যায়।

আমাদের পেশি কোষগুলো ল্যাকটিক এসিড ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় সীমিত ATP তৈরি করতে পারে কিন্তু প্রয়োজনীয় এনজাইম না থাকায় স্নায়ুকোষ (ব্রেইনসহ) তা পারে না। ফলে অক্সিজেনের অভাব হলে প্রথমেই স্নায়ু কোষের মৃত্যু ঘটে।

শ্বসনিক বস্তু : সুক্রোজ প্রথমে ভেঙ্গে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ হয়ে গ্লাইকোলাইসিস-এ প্রবেশ করে। গ্লুকোজ সরাসরি শ্বসনিক বস্তু হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য মনোস্যাকারাইড প্রথমে গ্লুকোজ হয়, পরে শ্বসনে প্রবেশ করে। স্টার্চ, গ্লাইকোজেন পলিমার ভেঙ্গে প্রথমে গ্লুকোজ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্বসনিক বস্তু হিসেবে কাজ করে। ফ্যাট ভেঙ্গে গ্লিসারল এবং ফ্যাটি এসিড-এ পরিণত হয়। গ্লিসারোল গ্লিসারেল্ডিহাইড-৩ ফসফেট হয়ে শ্বসনে অংশগ্রহণ করে, আর ফ্যাটি এসিড অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। প্রোটিন ভেঙ্গে অ্যামিনো এসিড তৈরি হয়; এর কতক অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে, আর কতক সাইট্রিক এসিড চক্রে প্রবেশ করে।

ফটোফসফোরাইলেশন ও অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	ফটোফসফোরাইলেশন	অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন
১. প্রক্রিয়া	এটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান।	এটি শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান।
২. পর্যায় সম্পন্ন	আলোর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।	আলো এবং অন্ধকার উভয় ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হয়।
৩. কোথায় ঘটে	ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে ঘটে।	মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টিতে ঘটে।
৪. কাদের ঘটে	উদ্ভিদে ঘটে, প্রাণিদেহে ঘটে না।	উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের দেহে ঘটে।
৫. আণবিক অক্সিজেন	কোনো আণবিক অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।	আণবিক অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।
৬. ফটোসিস্টেম	এতে ফটোসিস্টেম জড়িত।	এতে ফটোসিস্টেম জড়িত নয়।
৭. পানি	এই প্রক্রিয়ায় পানি বিশ্লিষ্ট হয়।	এ প্রক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয়।
৮. শক্তির উৎস	শক্তির মূল উৎস হলো সূর্যালোক।	ইলেক্টন পরিবহনের সময় জারণ-বিজারণের ফলে শক্তি মুক্ত হয় এবং তা থেকে ATP তৈরি হয়।
৯. ইলেকট্রন	ইলেকট্রন গ্রাহক ক্লোরোফিল এবং NADP.	ইলেকট্রন গ্রাহক অক্সিজেন।

ফসফোরাইলেশনের প্রকারভেদ

প্রকারভেদ	শক্তির উৎস	স্থল
১. ফটোফসফোরাইলেশন	সূর্যালোক	ক্লোরোপ্লাস্ট
২. সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন	বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না	সাইটোসল
৩. অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন	অক্সিজেনের সাহায্যে জারণ	মাইটোকন্ড্রিয়া

শক্তি উৎপাদনের পরিসংখ্যান

সবাত শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2 ও পানি উৎপাদনকালে নিম্নরূপ শক্তি উৎপাদন করে:

গ্লাইকোলাইসিস	পাইরুভিক এসিডের অক্সিডেশন	ক্রেব্‌স চক্র	ETC	সর্বমোট ATP
2ATP	.....	.....	.....→	= 2ATP
2NADH + H^+ (যা সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ কালে একটি ATP হারিয়ে $FADH_2$ তে পরিণত হয়।)	.....	.....	4ATP (Not 6)	= 4ATP
	2NADH + H^+.....	.....	6ATP	= 6ATP
		6NADH + H^+.....	18ATP	= 18ATP
		$2FADH_2$	4ATP	= 4ATP
		2ATP	.....→	= 2ATP
			32ATP	= 36 ATP

এখানে উল্লেখ্য যে, এক মোল গ্লুকোজকে পোড়ালে ৬৮৬ কিলোক্যালরি শক্তি বের হয় কিন্তু বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে মাত্র ৩৮০ কিলোক্যালরি কার্যকরী শক্তি পাওয়া যায় এবং বাকি শক্তি তাপশক্তি হিসেবে নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রতিটি ATP হতে মাত্র ১০ কিলোক্যালরি হিসেবে ৩৬টি ATP হতে ৩৬০ Kcal (৩৮ ATP হতে ৩৮০ KCal) শক্তি সরবরাহ হয়, যার ফলে কার্যক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় ৫৫.৪% বা তারও কম। অনেকের মতে ৪০%।

খ. অবাত শ্বসন (Anaerobic Respiration)

অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোনো মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না বা, অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় তাকে অবাত শ্বসন বলে।

CamScanner

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \underset{\text{ইথানল}}{2\,C_2H_5OH} + 2CO_2 + 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

অবাত শ্বসন দুটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়; যথা : **১। গ্লাইকোলাইসিস ও ২। পাইরুভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ।**

১. গ্লাইকোলাইসিস : এটি সবাত শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার অনুরূপ, গ্লাইকোলাইসিস উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম পযায়। এ ধাপে এক অণু গ্লুকোজ থেকে ২ অণু পাইরুভিক এসিড, ২ অণু $NADH + H^+$ ও ২ অণু ATP উৎপন্ন হয়।

২. পাইরুভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ : পাইরুভিক এসিড থেকে ইথানল অথবা ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি : অবাত শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরুভিক এসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল ও CO_2 অথবা শুধু ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি করে।

i. অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন তথা ইথানল সৃষ্টি : এটি দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে কার্বোক্সিলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক এসিড এক অণু CO_2 বের করে দিয়ে অ্যাসিট্যান্ডিহাইড উৎপন্ন করে এবং দ্বিতীয় ধাপে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় অ্যাসিট্যান্ডিহাইড, $NADH + H^+$ হতে দুটি হাইড্রোজেন গ্রহণ করে ইথানল (ইথাইল অ্যালকোহল) উৎপন্ন করে এবং NAD মুক্ত হয়ে যায়। ঈস্ট এবং কতিপয় ব্যাকটেরিয়াতে এ প্রক্রিয়া ঘটে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$\text{(i) } \underset{\text{পাইরুভিক এসিড}}{CH_3-CO-COOH} \xrightarrow[\text{কার্বোক্সিলেজ}]{CO_2\uparrow} \underset{\text{অ্যাসিট্যান্ডিহাইড}}{CH_3-CHO} \qquad \text{(ii) } \underset{\text{অ্যাসিট্যান্ডিহাইড}}{CH_3-CHO} \xrightarrow[\text{অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ}]{NADH+H^+ \;\; NAD} \underset{\text{ইথানল}}{CH_3-CH_2OH}$$

অবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ ভেঙ্গে ২ অণু ইথাইল অ্যালকোহল ও ২ অণু CO_2 উপন্ন হয়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + 2ADP + 2\,Pi \longrightarrow \underset{\text{ইথানল}}{2\,C_2H_5OH} + 2CO_2 + 2\,ATP = 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

অবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিসে $NADH + H^+$ উৎপন্ন হয়েছিল তা এক্ষেত্রে খরচ হয়ে গেল। কাজেই অবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় জমানো দুটি ATP ই শক্তির একমাত্র উৎস। দুটি ATP হতে শেষ পর্যন্ত ১০ × ২ = ২০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। ইথানল ও ল্যাকটিক এসিড টক্সিক, তাই এ প্রক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বলা হয়।

[ঈস্ট ছত্রাক হলো সুবিধাবাদী অবায়বীয় ছত্রাক। এটি যখন সবাত শ্বসন থেকে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করে তখন সমপরিমাণ শক্তির জন্য ১৮ গুণ দ্রুত গ্লুকোজ মেটাবলাইজ করে। পুনরায় বায়বীয় অবস্থায় এলে গ্লাইকোলাইসিস হ্রাস পায়। বায়বীয় ((aerobic) শ্বসনে ফিরে আসার প্রেক্ষিতে গ্লাইকোলাইসিস হ্রাস পাওয়াকে বলা হয় pasteur effect.]

ii. ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি : ল্যাকটিক এসিড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক এসিড $NADH + H^+$ হতে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে ল্যাকটিক এসিডে পরিণত হয়। ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টিকালে কোনো CO_2 উৎপন্ন হয় না। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি হয় না। **কতিপয় ব্যাক্টেরিয়া ও প্রাণীতে, বিশেষ করে পেশিতে, ল্যাকটিক এসিড অধিক উৎপন্ন হয়। অবাত শ্বসন অধিকাংশ আণুবীক্ষণিক জীবেরই শক্তি উৎপাদনের একমাত্র প্রক্রিয়া।**

$$\underset{\text{পাইরুভিক এসিড}}{CH_3-CO-COOH} \xrightarrow[\text{ল্যাকটিক এসিড ডিহাইড্রোজিনেজ}]{NADH+H^+ \;\; NAD} \underset{\text{ল্যাকটিক এসিড}}{CH_3-CHOH-COOH}$$

অবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ হতে ২ অণু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + 2ADP + 2\,Pi \longrightarrow \underset{\text{ল্যাকটিক এসিড}}{2\,C_3H_6O_3} + 2\,ATP = 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

ল্যাকটিক এসিড তৈরির সময় কোনো CO_2 উৎপন্ন হয় না এবং উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে কখনো ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় না। কতিপয় ব্যাকটেরিয়া ও প্রাণীর পেশিকোষে অবাত শ্বসনে ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি হয়।

অনেকক্ষণ ধরে ব্যায়াম বা খেলাধূলা বা অত্যন্ত কায়িক পরিশ্রম বা দৌড়ানোর সময় পায়ের পেশি অধিক সঞ্চালিত হয়, ফলে 5-6 সেকেন্ডের মধ্যেই পেশিকোষে সঞ্চিত ATP নিঃশেষ হয়ে যায়। নতুন ATP তৈরির জন্য তখন পেশিকোষে শ্বসন হতে হয়, কিন্তু দ্রুততার কারণে অক্সিজেনের অভাবে সেখানে সবাত শ্বসন না হয়ে অবাত শ্বসন ঘটে এবং ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি হয়। ল্যাকটিক এসিড বেশি সৃষ্টি হলে পেশি ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে ও সংকোচন ক্ষমতা সাময়িকভাবে নষ্ট হয় এবং খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে ল্যাকটিক এসিড দূরীভূত হয় ফলে পেশির ক্লান্তি দূর হয় এবং পেশি পুনরায় সক্রিয় হয়।

ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন (Fermentation)

কোষের বাইরে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জাইমেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ অণু অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল (অ্যালকোহল) বা ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি ও অল্প পরিমাণ শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন বলে। কিছু ব্যাক্টেরিয়া ও এককোষী ঈস্টে ফার্মেন্টেশন ঘটে। বিজ্ঞানের যে শাখায় ফার্মেন্টেশন সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয় তাকে জাইমোলোজি (Zymology) বলে। এ প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল, মদ, পাউরুটি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ফরাসী রসায়নবিদ লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, 1865) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঈস্টের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেন এবং একে অক্সিজেনবিহীন শ্বসন হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

প্রকৃতকোষী এবং আদিকোষী জীবে শ্বসনের স্থান	
প্রকৃতকোষী	**আদিকোষী**
(ক) মাইটোকন্ড্রিয়নের বাইরে (সাইটোপ্লাজমে) ১. গ্লাইকোলাইসিস ২. ফার্মেন্টেশন খ) মাইটোকন্ড্রিয়নের ভিতরে ম্যাট্রিক্স-এ : ৩. পাইরুভিক এসিড অক্সিডেশন ৪. ক্রেব্‌স চক্র গ) মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনার মেমব্রেন-এ ৫. ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন	(ক)সাইটোপ্লাজমে ১. গ্লাইকোলাইসিস ২. ফার্মেনেটেশন ৩. ক্রেব্‌স চক্র খ) প্লাজমামেমব্রেনের ভিতরের তল (inner surface) ৪. ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন।

বিভিন্ন শিল্পে অবাত শ্বসন তথা ফার্মেন্টেশনের ব্যবহার

বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক শিল্প। নিচে সংক্ষেপে এর কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো।

i. পাউরুটি শিল্পে : বেকিং ঈস্টকে (baking yeast) ময়দার সাথে মিশিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে দিলে নির্দিষ্ট সময় পরে পারমেনটেশন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল ও CO_2 উৎপন্ন হয়। CO_2 ময়দার দলার মধ্যে বুদবুদ সৃষ্টি করে ফলে ময়দার দলা ফুলে উঠে। এ অবস্থায় দলাকে চুল্লির তাপে গরম করা হলে CO_2 এর বুদবুদগুলো প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং ময়দার দলাগুলো স্পঞ্জি পাউরটিতে পরিণত হয়। এসময় অ্যালকোহল বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়।

ii. মদ্য শিল্পে : ঈস্টের অবাত শ্বসন তথা ফার্মেন্টেশনকে কাজে লাগিয়ে মদ তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আঙ্গুরের রস থেকে ওয়াইন এবং আপেলের রস থেকে সিডার প্রস্তুত করা হয়।

iii. অ্যালকোহল প্রস্তুতে : শর্করার সাথে ঈস্টের ফার্মেন্টেশন বিক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়। দর্শনা চিনি কলে চিটাগুড় (molasses) থেকে এ প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। একই প্রক্রিয়ায় বিউটানল, প্রপানল ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হয়।

iv. দুধ শিল্পে : দুধের সাথে *Lactobacillus helveticus, Streptococcus lactis* ইত্যাদি ব্যাক্টোরিয়া মিশিয়ে ৩-৫ ঘন্টার মধ্যে ৩৭°–৩৮°C তাপমাত্রায় দই তৈরি করা হয়। এটিও ব্যাক্টোরিয়ার অবাত শ্বসনের ফল। পনির ও মাখন তৈরিতেও একই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

CamScanner

v. **আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পে :** অনেক আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরিতে বিভিন্ন ড্রাগের মিশ্রণের সাথে চিটাগুড় দিয়ে পাত্র ঢেকে দেয়া হয় (এমনকি মাটির নিচে বেশ কিছুদিন রাখা হয়)। এতে চিটাগুড় থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয় যাতে বিভিন্ন ড্রাগের ওষুধিগুণ অ্যালকোহল কর্তৃক শোষিত হয়।

vi. **চা, তামাক ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে :** *Bacillus megatherium* নামক ব্যাক্টেরিয়া, চা ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং ফলে সবুজপাতা তাম্র বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সুগন্ধযুক্ত হয়। কফি শিল্পেও এর প্রয়োগ আছে।

vii. **মাংস ও মাছ শিল্পে :** বিভিন্ন ঈস্ট ও কতিপয় ছত্রাক (*Penicillium, Aspergillus*) ব্যাক্টেরিয়া (*Pedicoccus* sp., *Bacillus* sp.) ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত হচ্ছে মাংসজাত দ্রব্য, যেমন-দক্ষিণ আমেরিকায় কিউরেডহ্যাম (Curedham), মাছ হতে তৈরি জাপানে কাতসুবুশি (Katsuobushi) প্রভৃতি।

viii. **ভিটামিন তৈরিতে :** থিয়ামিন ও রিবোফ্ল্যাবিন নামক ভিটামিন B_1 ও B_2 এই প্রক্রিয়ায় ঈস্টের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

ix. **ভিনেগার উৎপাদন :** গুড়ের মধ্যে ঈস্ট মিশিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এতে *Acetobacter aceti* নামক ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে জারণ ক্রিয়ায় এসিড বা ভিনেগার উৎপন্ন করা হয়।

x. **কৃষি পণ্য উৎপাদনে:** অণুজীবের ফারমেনটেশন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানারকম কৃষি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। এরকম কয়েকটি কৃষি পণ্য হলো– প্রাণিজাত: কিউরেড হ্যাম (আমেরিকা), কাতসুবুশি (জাপান) ইত্যাদি এবং উদ্ভিদজাত ক্যাকাও (আমেরিকা), কফি বিন (ব্রাজিল), কিমচি (জাপান), আচার (বাংলাদেশ) ইত্যাদি।

xi. **কোমল পানীয় শিল্পে :** বিভিন্ন প্রকার কোমল পানীয়ের প্রধান উপাদান সাইট্রিক এসিড গাঁজন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়।

xii. **চর্ম শিল্পে :** চামড়া শিল্পে চামড়া থেকে পশুর লোম উঠিয়ে ফেলার জন্য এবং চর্বি ও অন্যান্য টিস্যু আলাদা করার জন্য বিশেষ ধরনের ব্যাক্টেরিয়া (*Bacillus subtilis*) ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাক্টেরিয়ার গাঁজনের ফলে চামড়া থেকে লোম, মেদটিস্যু ইত্যাদির অপসরণ ঘটে।

সবাত শ্বসন ও ফার্মেন্টেশনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সবাত শ্বসন	ফার্মেন্টেশন
১. অক্সিজেন	মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে।	অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ঘটে।
২. শ্বসনিক বস্তুর জারণ	শ্বসনিক বস্তু সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়।	শ্বসনিক বস্তু আংশিকরূপে জারিত হয়।
৩. উৎপন্ন শক্তি	উৎপন্ন শক্তির সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে।	শক্তির আংশিক মুক্তি ঘটে।
৪. উপজাত পদার্থ	উপজাত পদার্থ হিসেবে পানি ও CO_2 উৎপন্ন হয়।	উপজাত পদার্থ হিসেবে CO_2 ও অ্যালকোহল বা বিভিন্ন প্রকার জৈব এসিড (ল্যাকটিক এসিড, বিউটারিক এসিড প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়।
৫. সংঘটনের স্থান	সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে ঘটে।	কোষের সাইটোপ্লাজমে অথবা কোষের বাইরে ঘটে।
৬. ATP	অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।	স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।
৭. ক্রিয়াস্থল	জীবিত কোষের মধ্যে ক্রিয়াশীল।	জীবিত কোষের বাইরে ক্রিয়াশীল।
৮. জীবের প্রকার	অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে ঘটে।	ঈস্ট কোষ, কিছু অণুজীব ও প্রাণিদেহে পেশি কোষে ঘটে।

শ্বসনিক হার বা রেসপিরেশন কোশেন্ট (Respiration Quotient or RQ)

শ্বসনের সময় গৃহীত O_2 এবং নির্গত CO_2 এর পরিমাণ হতে শ্বসনের অনুপাত নির্ণয় করা যায়। **নির্দিষ্ট সময়ে শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট বা RQ বলে।** RQ এর মান থেকে শ্বসন বস্তু ও শ্বসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

CamScanner

$$\text{শ্বসনিক হার (RQ)} = \frac{\text{নির্গত } CO_2 \text{ এর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } O_2 \text{ এর পরিমাণ}}$$ [সবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে]

বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তুর জন্য শ্বসনিক কোশেন্ট বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। শ্বসনিক বস্তু গ্লুকোজ হলে RQ এর মান ১ হয়। চর্বি জাতীয় পদার্থ শ্বসনিক বস্তু হলে RQ এর মান ১ এর কম হয়, কারণ চর্বি জাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণ জারিত হতে অধিক পরিমাণ O_2 এর প্রয়োজন পড়ে। জৈব এসিডের RQ এর মান ১ এর বেশি হয়, কারণ জৈব এসিডে CO_2 এর পরিমাণ O_2 থেকে বেশি। প্রোটিনের RQ এর মান ১ এর কম (০.৮৩) হয়। মরুজ উদ্ভিদে RQ অত্যন্ত কম এমনকি শূন্য হতে পারে।

বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তুর শ্বসন অনুপাত

শ্বসন	শ্বসনবস্তু	রাসায়নিক বিক্রিয়া	শ্বসন অনুপাত
সবাত শ্বসন	গ্লুকোজ	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	$RQ = \frac{6CO_2}{6O_2} = 1$
সবাত শ্বসন	ম্যালিক এসিড (জৈব এসিড)	$C_4H_6O_5 + 3O_2 \rightarrow 4CO_2 + 3H_2O$	$RQ = \frac{4CO_2}{3O_2} = 1.33$
সবাত শ্বসন	টারটারিক এসিড (জৈব এসিড)	$2C_4H_6O_6 + 5O_2 \rightarrow 8CO_2 + 6H_2O$	$RQ = \frac{8CO_2}{5O_2} = 1.6$
সবাত শ্বসন	অ্যালানিন (অ্যামিনো এসিড)	$2C_3H_7O_2N + 6O_2 \rightarrow CO_2(NH_2)_2 + 5CO_2 + 5H_2O$	$RQ = \frac{5CO_2}{6O_2} = 0.83$
সবাত শ্বসন	পামিটিক এসিড (ফ্যাটি এসিড)	$C_{16}H_{32}O_2 + 23O_2 \rightarrow 16CO_2 + 16H_2O$	$RQ = \frac{16CO_2}{23O_2} = 0.7$
সবাত শ্বসন	গ্লুকোজ (CAM উদ্ভিদ)	$2C_6H_{12}O_6 + 3O_2 \rightarrow 3C_4H_6O_5 + 3H_2O$	$RQ = \frac{0}{3O_2} = 0$
অবাত শ্বসন	গ্লুকোজ	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2O_5OH + 2CO_2$	$RQ = \frac{2CO_2}{0} = \infty$

শ্বসনের প্রভাবকসমূহ (Factors of Respiration)

বেশ কিছু সংখ্যক পরিবেশগত ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবক শ্বসন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবক সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলে।

ক. বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

১. তাপমাত্রা : শ্বসন প্রক্রিয়া বিভিন্ন এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এনজাইমের কার্যকারিতা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি শ্বসনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাপমাত্রা ০° - ৩০° সে. পর্যন্ত বাড়ালে শ্বসন হার বাড়তে থাকে। ০° সে. বা তার কম তাপমাত্রায় শ্বসন হার হ্রাস পায়। আর ০° সে. তাপমাত্রায় শ্বসন হার খুবই কম। ২০°-৩৫° সে. তাপমাত্রায় শ্বসন প্রক্রিয়া খুব ভালো চলে। ৪৫° সে. তাপমাত্রার উপর এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ায় শ্বসন প্রক্রিয়া বেশ কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়।

২. অক্সিজেন : সবাত শ্বসনে পাইরুভিক এসিডের সম্পূর্ণ জারণের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়লে সবাত শ্বসনের হার বাড়ে এবং অক্সিজেনের অভাব হলে সবাত শ্বসন বন্ধ হয়ে যায়। অক্সিজেনের ঘনত্ব ১% এ গেলে শ্বসন হার সবচেয়ে কম হয়।

৩. পানি : শ্বসনের কিছু বিক্রিয়ায় পানি প্রয়োজন হয়। তাই পানি শ্বসন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে, শুষ্ক বীজে পানি শোষণের ফলে শ্বসন হার বেড়ে যায়।

৪. কার্বন ডাইঅক্সাইড : বায়ুমন্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব বেড়ে গেলে শ্বসন কমে যায়। CO_2 বেড়ে গেলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়, এর ফলে গ্যাসীয় আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে শ্বসন হার হ্রাস পায়।

৫. আলো : আলোতে পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত থাকে বলে গ্যাসীয় আদান-প্রদান সহজ হয় এবং আলোকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শ্বসনিক বস্তু সৃষ্টি হয়, এর ফলে শ্বসন হার বেড়ে যায়। আলোর উপস্থিতিতে- C_3 উদ্ভিদে আলোকশ্বসন ঘটে।

৬. মাটিস্থ অজৈব লবণ : মাটিস্থ অজৈব লবণ যেমন NaCl, KCl, $CaCl_2$, $MgCl_2$ ইত্যাদি) এর সরবরাহ বেশি হলে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়। অজৈব লবণের উপস্থিতিতে শ্বসন হার বৃদ্ধিকে লবণ-শ্বসন (salt respiration) বলে। পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, উদ্ভিদকে সাধারণ পানি থেকে লবণ দ্রবণে রাখলে শ্বসন হার বেড়ে যায়।

৭. আঘাত : আঘাতপ্রাপ্ত টিস্যুতে স্বাভাবিক টিস্যু থেকে কোষ বিভাজন দ্রুততর হয়। ফলে শ্বসনের হারও বেড়ে যায়।

৮. রোগ : রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে শ্বসনের হার বেড়ে যায়, কারণ এদের ATP এর প্রয়োজন বেশি হয়।

খ. অভ্যন্তরীণ প্রভাবকমূহ

১. কোষস্থ পানি : পানি বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তু দ্রবীভূত করতে এবং এনজাইমের কার্যকারিতা প্রকাশে সাহায্য করে। তাই কোষে পানির অভাব হলে শ্বসন হার কমে যায়।

২. কোষের প্রোটোপ্লাজম : কোষে প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণের ওপর শ্বসনের হার নির্ভরশীল। ভাজক কলার কোষে প্রোটোপ্লাজম বেশি থাকায় এর শ্বসন হার বেড়ে যায়।

৩. জটিল খাদ্যদ্রব্য : শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রধান শ্বসনিক বস্তু গ্লুকোজ। কোষের বিভিন্ন বিক্রিয়ায় জটিল খাদ্য গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। কাজেই জটিল খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরণ শ্বসন হার নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. কোষের বয়স : বয়স্ক কোষ অপেক্ষা নবীন কোষে শ্বসন হার বেশি হয়। কারণ, অল্পবয়স্ক কোষে প্রোটোপ্লাজম অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

৫. কোষস্থ অজৈব লবণ : কোষ-মধ্যস্থ অজৈব লবণও শ্বসনের হারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, কারণ এদের কিছু উপাদান শ্বসনিক বিক্রিয়ায় অ্যাক্টিভেটর বা কো-ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

৬. এনজাইম : এনজাইমের ওপর সম্পূর্ণ শ্বসন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত এনজাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে শ্বসন হার বেড়ে যায়।

৭. মাটিতে অজৈব লবণ : মাটিতে NaCl, KCl, CaCl ও MgCl এর দ্রবণের সরবরাহ বৃদ্ধি ঘটিয়ে শ্বসন হার বৃদ্ধি করা যায়।

৮. অন্যান্য প্রভাবক : আঘাতপ্রাপ্ত টিস্যুতে আঘাত নিরাময়ের জন্য কোষ বিভাজন দ্রুততর হয়, ফলে শ্বসন হার বেড়ে যায়। হাত দিয়ে পাতা মৃদু ঘষে দিলে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়।

শ্বসনের গুরুত্ব (Importance of Respiration)

শ্বসন জীবের একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। নিচে শ্বসনের গুরুত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

১. শক্তি উৎপাদন : জীবের সব ধরনের জৈবনিক কার্যকলাপের জন্য শক্তি অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় সব শক্তি শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্য থেকে নির্গত হয়।

২. CO_2 এর ব্যবহার : শ্বসন প্রক্রিয়ায় নির্গত CO_2 সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং জীবজগতের জন্য প্রয়োজনীয় শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে।

৩. বিপাকীয় শক্তির যোগান : উদ্ভিদে পুষ্টি মৌলের শোষণে যে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় তা শ্বসন থেকে আসে। শ্বসনের হার কমে গেলে পুষ্টি মৌলের শোষণ ও কমে যায়। ফলে বিপাকীয় কাজ ব্যাহত হয়।

৪. কোষ বিভাজন ও দৈহিক বৃদ্ধি : শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাব কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার উপরও প্রতিফলিত হয়। কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি ও কিছু আনুষঙ্গিক পদার্থ শ্বসন প্রক্রিয়া হতে আসে। তাই এ প্রক্রিয়া জীবের দৈহিক বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. তাপমাত্রা রক্ষা : শ্বসনে সৃষ্ট তাপ জীবদেহের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় থাকে।

৬. এনজাইম ও জৈব এসিড উৎপাদন : এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপক্ষার ও জৈব এসিড সৃষ্টিতে সহায়তা করার মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য জৈবিক কার্যক্রমেও সহায়তা করে।

৭. বায়ুমন্ডলে CO_2 ও O_2 এর ভারসাম্য রক্ষা : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডল থেকে CO_2 গৃহীত হয় এবং O_2 বর্জিত হয়। কিন্তু শ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডল হতে O_2 গৃহীত হয় এবং CO_2 বর্জিত হয়, তাই বায়ুমন্ডলে CO_2 ও O_2 এর ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

CamScanner

৮. যৌগ সংশ্লেষণ : শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিভিন্ন যৌগ উদ্ভিদে অ্যামিনো এসিড, নিউক্লিক এসিড, গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, লিপিড ইত্যাদি যৌগ সংশ্লেষণে কাজে লাগে।

৯. শিল্পে ব্যবহার : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠেছে অ্যালকোহল, মদ, সিরকা, আচার, মাছ ও মাংসের সস ইত্যাদি উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

১০. বেকারি ও দুগ্ধজাত শিল্প : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় বেকারি (পাউরুটি) ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি (দই, পনির) উৎপাদন করা হয়।

সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সবাত শ্বসন	অবাত শ্বসন
১. অক্সিজেন	মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।	মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
২. পাইরুভিক এসিডের জারণ	পাইরুভিক এসিডের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে।	পাইরুভিক এসিডের আংশিক জারণ ঘটে।
৩. CO_2 উৎপাদন	অধিক পরিমাণ CO_2 উৎপন্ন হয়	অল্প পরিমাণ CO_2 উৎপন্ন হয় বা আদৌ হয় না।
৪. পানি উৎপাদন	পানি উৎপন্ন হয়।	পানি উৎপন্ন হয় না।
৫. অ্যালকোহল ও ল্যাকটিক এসিড	উৎপন্ন হয় না।	উৎপন্ন হয়।
৬. সংগঠনের স্থান	সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে ঘটে।	মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমে ঘটে।
৭. কোন জীবে ঘটে	অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে ঘটে।	কিছু অণুজীব, পরজীবী প্রাণী, বীজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঘটে। উন্নত জীবে O_2 এর অভাবে সাময়িকভাবে ঘটে থাকে।
৮. শক্তি	ATP আকারে 36 ATP হতে ৩৬০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।	ATP আকারে 2 ATP হতে মাত্র ২০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।
৯. ATP উৎপাদন	36 টি	2 টি

অবাত শ্বসন ও ফার্মেন্টেশনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অবাত শ্বসন	ফার্মেন্টেশন
১. ক্রিয়াস্থল	এটি জীবিত কোষের মধ্যে ক্রিয়াশীল।	এটি জীবিত কোষের বাইরে ক্রিয়াশীল।
২. সংঘটনের স্থান	মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে অর্থাৎ কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়।	কোষের সাইটোপ্লাজমে অথবা কোষের বাইরে ঘটে।
৩. কোষের প্রকার	পূর্ণ অবায়ুজীবী জীবকোষে ঘটে। অনেক সময় উন্নত জীবকোষে O_2 এর অভাবে সাময়িকভাবে ঘটে।	পূর্ণ অবায়ুজীবী বা আংশিক অবায়ুজীবী জীবকোষে ঘটে।
৪. উদ্ভিদ	উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে ঘটে।	শুধুমাত্র ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার মতো নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।
৫. মাধ্যম	কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।	তরল মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।
৬. বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ	এতে কোষের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন এনজাইম সরাসরি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।	কোষ থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন এনজাইম বাইরে নিঃসৃত হয়ে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
৭. গ্লুকোজ-এর উৎস	দেহের অভ্যন্তরীণ গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।	বাহ্যিক গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
৮. উৎপন্ন দ্রব্যের অবস্থান	এ প্রক্রিয়ায় কোষের ভিতর অ্যালকোহল ও CO_2 সঞ্চিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় কোষের বাইরে অ্যালকোহল ও CO_2 সঞ্চিত হয়।

CamScanner

অবাত শ্বসনে CO_2 গ্যাস নির্গমনের পরীক্ষা
(Experiment of Production of CO_2 during Anaerobic Respiration)

তত্ত্ব : শ্বসন একটি জৈবনিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় O_2-এর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে কোষের জৈব খাদ্য জারণের মাধ্যমে শক্তি নির্গত হয় এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন হয়।

অবাত শ্বসন O_2-এর অনুপস্থিতিতে ঘটে থাকে। এতে শ্বসনিক বস্তু অসম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে C_2H_5OH (ইথাইল অ্যালকোহল) ও CO_2 উৎপন্ন হয় এবং অল্প পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

উপকরণ : একটি টেস্ট টিউব, একটি পেট্রিডিস, পারদ, ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যান্ড, কয়েকটি অঙ্কুরিত ভেজা ছোলা, একটি বাঁকা চিমটা ও কষ্টিক পটাশ (KOH)-এর টুকরা।

কার্যপদ্ধতি

১. প্রথমে অঙ্কুরিত ছোলাবীজগুলোর খোসা ছাড়িয়ে রাখতে হবে।

২. এরপর ছোট বিকারটিতে কিছু পারদ ঢালতে হবে।

৩. টেস্ট টিউবটি পারদ দিয়ে সম্পূর্ণ ভর্তি করতে হবে।

৪. এবার টেস্ট টিউবের মুখ বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে পেট্রিডিসে পারদের ওপর উপুড় করে স্ট্যাণ্ডের সাথে ক্লিপ দিয়ে আটকাতে হবে। টেস্ট টিউবটি এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে এর মুখ পারদ পূর্ণ পেট্রিডিসের তলা স্পর্শ না করে।

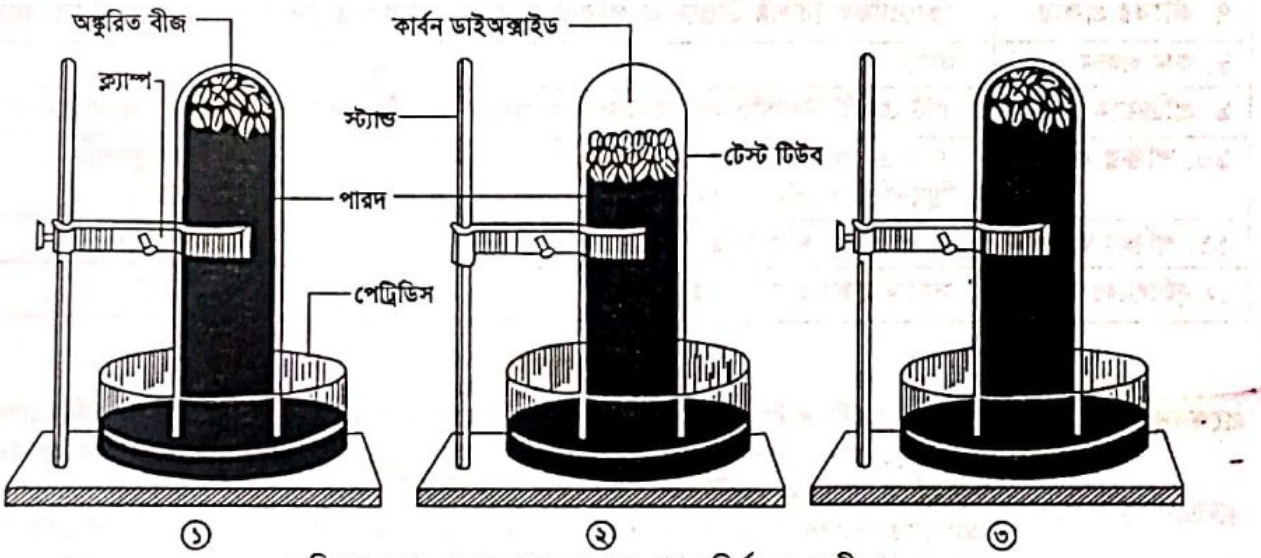

চিত্র ৯.৪.৪ : অবাত শ্বসনে CO_2 গ্যাস নির্গমনের পরীক্ষা

৫. এখন ছোলাবীজগুলো বাঁকা চিমটার সাহায্যে একটা একটা করে টেস্ট টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ছোলাবীজগুলো পারদের চেয়ে হালকা বলে টেস্ট টিউবের উপরের প্রান্তে উঠে যাবে। ছোলাবীজ ঢুকানোর সময় টেস্ট টিউবে যাতে বায়ু প্রবেশ না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এ অবস্থায় পর্যবেক্ষণের জন্য একদিন রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : একদিন পর দেখা যাবে টেস্ট টিউবের পারদ স্তম্ভ কিছুটা নিচে নেমে এসেছে। এ অবস্থায় এক টুকরা কস্টিক পটাশ বাঁকা চিমটার সাহায্যে টেস্ট টিউবে প্রবেশ করালে দেখা যাবে টেস্ট টিউবের ফাঁকা স্থান পুনরায় পারদ দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত

১. প্রথমে সম্পূর্ণ পারদ দিয়ে পূর্ণ থাকা টেস্ট টিউবের মধ্যে অক্সিজেন ছিল না।

২. টেস্ট টিউবের মধ্যে বাতাস না থাকায় ছোলাবীজের অবাত শ্বসনে যে CO_2-গ্যাস নির্গত হয়েছে তার জন্যই পরদ স্তম্ভ নিচে নেমেছে।

৩. কস্টিক পটাশ প্রবেশ করানোর ফলে ঐ CO_2 গ্যাস শোষিত হওয়ায় পারদ স্তম্ভ আবার উপরে উঠেছে। আমরা জানি কস্টিক পটাশ CO_2 গ্যাস শোষণ করে।

অতএব এ পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণিত হলো যে– অবাত শ্বসনে CO_2 গ্যাস নির্গত হয়।

সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	সালোকসংশ্লেষণ	শ্বসন
১. সংঘটনের স্থান	ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ কোষে ঘটে।	সব সজীব কোষে ঘটে।
২. প্রধান উপাদান	পানি ও CO_2 প্রধান সালোকসংশ্লেষণীয় বস্তু।	শর্করা জাতীয় বস্তু ও O_2 প্রধান শ্বসনীয় বস্তু।
৩. উৎপন্ন দ্রব্য	শর্করা ও O_2 উৎপন্ন হয়।	প্রধানত পানি ও CO_2 উৎপন্ন হয়; তবে CO_2 ও অ্যালকোহল এবং অনেকক্ষেত্রে শুধু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়।
৪. বিক্রিয়ার স্থান	সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া কোষের ক্লোরোপ্লাস্টে সংঘটিত হয়।	প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং শেষ পর্যায় মাইটোকন্ড্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।
৫. প্রধান ধাপ	ফটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন ও ক্যালভিন চক্র।	গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি, ক্রেবস চক্র ও ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র।
৬. গৃহীত ও নির্গত পদার্থ	CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে।	O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে (সবাত শ্বসনে)
৭. জীবের প্রকার	ক্লোরোফিল বিশিষ্ট উদ্ভিদে এ প্রক্রিয়া চলে।	সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীতে এ প্রক্রিয়া চলে।
৮. শুষ্ক ওজন	বাড়ে	কমে।
৯. প্রক্রিয়ার ধরণ	এটি একটি উপচিতি বা গঠনমূলক প্রক্রিয়া।	এটি একটি অপচিতি বা ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া।
১০. শক্তির রূপান্তর	এ প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক স্থিরশক্তিতে পরিণত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক স্থিরশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়।
১১. শক্তির অবস্থান	এ প্রক্রিয়ায় শক্তি সঞ্চিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হয়।
১২. সূর্যালোকের আবশ্যকতা	সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়।	আলোক নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া।

সারসংক্ষেপ

প্রস্বেদন : প্রস্বেদন একটি শারীতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। বাষ্প বের হয়ে যাওয়ার পথে ভিন্নতা অনুযায়ী প্রস্বেদন তিন প্রকার, যথা **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, লেন্টিকুলার প্রস্বেদন এবং কিউটিকুলার প্রস্বেদন**। অধিকাংশ উদ্ভিদে দিনের আলোতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং প্রস্বেদন ঘটে। মরুভূমির মতো প্রখর সূর্যালোকের এলাকায় সাধারণত পত্ররন্ধ্র দিনে বন্ধ থাকে এবং রাতে খোলা থাকে, তাই মরু উদ্ভিদে প্রস্বেদন রাতে হয়ে থাকে। এটি উদ্ভিদের একটি অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য।

সালোকসংশ্লেষণ : সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের সবুজ পাতায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়াকে **সালোকসংশ্লেষণ বলে**। সালোকসংশ্লেষণে শর্করার সাথে উপজাত হিসেবে অক্সিজেন নির্গত হয়।

ফটোফসফোরাইলেশন: আলোকশক্তির সাহায্যে কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়া হলো ফটোফসফোরাইলেশন। প্রকৃতপক্ষে সূর্যশক্তির সাহায্যে ADP এর সাথে এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে ATP তৈরি হওয়ার নামই **ফটোফসফোরাইলেশন**। অচক্রীয় ও চক্রীয়-এ দুই প্রক্রিয়ায় ফটোফসফোরাইলেশন হয়ে থাকে। উদ্ভিদের জীবনে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ATP ব্যবহার করে সবুজ উদ্ভিদ শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে।

শ্বসন : যে প্রক্রিয়ায় এনজাইম নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জীবকোষের অভ্যন্তরে জটিল জৈব যৌগ জারণের মাধ্যমে সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং শক্তি নির্গত হয় তাকে শ্বসন বলে।

গ্লাইকোলাইসিস : শ্বসনের প্রাথমিক ধাপ হলো **গ্লাইকোলাইসিস**। এ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিড তৈরি করে। পাইরুভিক এসিড পরে সবাত শ্বসনে অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেবস চক্র ও ETC এ প্রবেশ করে শক্তি ও O_2 উৎপন্ন করে। গ্লাইকোলাইসিস কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়।

CamScanner